প্রথম বাংলা সংস্করণ :
জুলাই ১৯৬২
দ্বিতীয় সংস্করণ : আগষ্ট ১৯৬৮

তৃতীয় মুদ্রণ : জুন ১৯৮৩

প্রকাশ করেছেন :
সুনীল বসু
ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড,
১২, বঙ্কিম চাটার্জী স্ট্রিট, কলিকাতা-১২

ছেপেছেন :
রবীন দত্ত,
ফ্রেণ্ডস্ গ্রাফিক,
১১ বি বিডন রো, কলিকাতা-৬

অনুবাদ :
প্রতিভা গাঙ্গুলী

প্রচ্ছদ :
শ্রীগণেশ বসু

দাম : ৫·৫০

এই বইটি যিনি লিখেছেন, এম ইলিন, তিনি একজন তরুণ ইঞ্জিনিয়ার। এই বইটির সঙ্গে তিনি আরো লিখেছেন "সাদার উপর কালো" (Black on White) ও "কটা বাজল?" (What Time Is It?)। ইলিন রাশিয়ার বিখ্যাত কবি ও ছোট গল্প লিখিয়ে মার্শাকের ভাই। এই দুই ভাই সোভিয়েতের এমন এক লেখক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত যাঁরা বিজ্ঞান, ইতিহাস ও সোভিয়েত জীবনযাত্রা প্রণালী অধ্যয়ন করেন ও এমন সব বই লেখেন যার পাঠক কেবলমাত্র শিশুরা নয়, কলকারখানার শ্রমিক ও ক্ষেতখামারের কৃষকরাও। এই গোষ্ঠীর অনেক সভ্যই শিল্পী। এঁদের একজন লাল ফৌজের রাঁধুনী ছিলেন, আর দুজন অতীতে ছিলেন গৃহহারা শিশু। এঁরা সকলেই সমবেতভাবে চেষ্টা করে চলেছেন যে-পৃথিবীতে আমরা বাস করি তার সত্যিকারের পরিচয়ের উপর সহজ সরল গল্প লেখার।

সূচীপত্র

শত সহস্র জিজ্ঞাসা

ঘরের ভিতরে চারিদিকটা ঘুরে দেখ

ঘরের ভিতরে চারিদিকটা ঘুরে দেখ

"পাঁচ হাজার কোথায়, সাত হাজার কি করে,
এক লক্ষ কেন।" —রুড্ইয়ার্ড কিপ্লিঙ

তোমাদের বাড়ির রোজকার ঘটনা।

সকালে উঠে কেউ না কেউ উনুন ধরায়, তাতে জল গরম হয়, খাবার তৈরি হয়।

তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো জানো কেমন করে উনুন ধরাতে হয়, কেউবা হয়তো খাবারও তৈরি করতে পার। কিন্তু ধরো, আমি জিগ্যেস করলাম, "আচ্ছা কাঠ পোড়াতে তো দেখেছ, কিন্তু কাঠ যখন পোড়ানো হয় তখন ঐ রকম ফট্‌ফট্ শব্দ হয় কেন?" "ঘরের ভিতরে না এসে ধুয়োটা চিমনির ভিতর দিয়ে উপরে উঠে যায় কেন?" "কেরোসিন তেল জ্বালালে ঝুল পড়ে কেন?" "আলু ভাজলে তার চারিদিকে একটা শক্ত খোসামতো পড়ে অথচ সেদ্ধ করলে সেটা হয় না কেন?"

নিশ্চয়ই এসব প্রশ্নের ভাল উত্তর দিতে পারবে না।

কিংবা ধরো এই প্রশ্নটা: "আগুনে জল ঢাললে আগুন নিভে যায় কেন?" একজন বললে: "জল যে ঠাণ্ডা, আর সব জিনিসকে যে ভিজিয়ে দেয়।" বেশ মেনে নিলাম; কিন্তু

কেরোসিন তেলও ঠাণ্ডা, আর তা দিয়ে সব ভিজিয়ে দেওয়া যায়। একবার কেরোসিন তেল ঢেলে আগুন নেভাতে চেষ্টা করো তো! অবশ্য এমন কাজ করতে আমি তোমাদের বলব না; কেননা তা যদি করো তাহলে হয়তো শেষ পর্যন্ত তোমাদের দমকল ডাকতে হবে।

তাহলেই দেখছ, প্রশ্নটা যত সোজা, জবাবটা তত সোজা নয়। এই রকম খুব সাধারণ জিনিস সম্পর্কে কয়েকটা প্রশ্ন শুনতে চাও?

* একরকম কাপড়ের তৈরি তিনটে জামা আর ওর তিনগুণ মোটা কাপড়ের একটা জামা—কোন্‌টা পরলে শরীর বেশী গরম হয়?

* বাতাস দিয়ে দেয়াল দেওয়া যায় কি?

* আগুনের ছায়া পড়ে, কি পড়ে না?

* জলে আগুন ধরানো যায় না কেন?

* জল ঢেলে কি বালি উড়িয়ে দেওয়া যায়?

* স্টোভ ধরালে ঐ রকম একটা শোঁ শোঁ করে শব্দ হয় কেন?

* দেশলাই জ্বেলে সেটা নিভোতে হলে কেন আমরা ফুঁ দেই?

* স্বচ্ছ লোহা বলে কিছু আছে কি?

* রুটিতে ফুটো থাকে কেন?

* আগুনের পাশে গিয়ে বসলে আমাদের শরীর

গরম হয়, কেননা আগুন গরম, কিন্তু একটা পশমের কোট পরলে শরীর গরম হয় কেন ?

* গরম জামা ইস্ত্রি করবার সময় কেন তার ওপর একটা ভিজে কাপড় দেওয়া হয় ?

* বরফের উপর স্কেটিং করা হয়, মেঝের উপর করা হয় না কেন ?

এসব প্রশ্নের উত্তর তোমাদের মধ্যে খুব কম ছেলেমেয়েই দিতে পারবে। এসব হচ্ছে এমন সব জিনিস যেগুলো নিয়ে রোজই আমাদের নাড়াচাড়া করতে হয় ; অথচ এগুলো সম্পর্কে আমরা প্রায় কিছুই জানি না। আর কেউ তো এসব প্রশ্ন জিজ্ঞাসাও করে না। তাছাড়া বই পড়েও জানবার উপায় নেই। রেল গাড়ির ইঞ্জিন যে কি করে চলে সে সম্বন্ধে অনেক বই আছে। টেলিফোন টেলিগ্রাফে কি করে বার্তা যায় সে বিষয়েও যথেষ্ট পড়বার জিনিস আছে। কিন্তু "আলু ভাজার" বিষয়ে বা স্টোভের পোকারের বিষয়ে কোন বই কেউ কোনদিন দেখেছ ? বই অবশ্য আছে, তবে তার বই নয় ; নানান বিষয়ে লেখা নানান বই থেকে এই বারোটি প্রশ্নের উত্তর জানতে হবে।

শুধু বারোটি নয়, এরকম হাজার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে। ঘরে যা কিছু জিনিসই আছে সব নিয়েই প্রশ্ন। "এটা কি দিয়ে তৈরি আর কেনই বা তা দিয়ে তৈরি ? কবে এই জিনিসটার আবিষ্কার হয়েছে ?" যেমন ধরো, ছুরি আর কাঁটা। ছুরি আর কাঁটাকে আলাদা ভাবে ভাবতে পারা

যায় না। অথচ তোমরা শুনে আশ্চর্য হবে এই ছুরির ব্যবহার আরম্ভ হয়েছিল লক্ষ বছর আগে, অথচ কাঁটার ব্যবহার হচ্ছে মাত্র তিনশ বছর থেকে। আদিম মানুষও ছুরির ব্যবহার জানত। অবশ্য প্রথম প্রথম ছুরি লোহার তৈরি হত না—হত পাথরের।

তোমরা হয়তো চট্ করে বলতে পারবে, কে কবে টেলিফোন আবিষ্কার করলেন, কিংবা কে কবে প্রথমে ইলেক্‌ট্রিক আলো জ্বাললেন। কিন্তু যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, "আচ্ছা বল তো কবে আয়না আবিষ্কার হল? কবে থেকে রুমাল ব্যবহার শুরু হল? কবে থেকে মানুষ সাবান ব্যবহার করতে শিখল? কবে থেকে আমরা আলু খেতে আরম্ভ করেছি?" এসব প্রশ্নের জবাব খুব অল্প লোকই দিতে পারে।

আমাদের সকলেরই দেশবিদেশের গল্প, অ্যাডভেঞ্চারের গল্প, অজানা দেশ আবিষ্কারের কথা শুনতে বেশ ভাল লাগে। কিন্তু কেউ আমরা ভুলেও কি ভাবি যে আমাদের হাতের কাছেই এ রকম অজানা একটা দেশ রয়েছে, আর সেটা হচ্ছে আমাদের বাড়ি। আরও সুবিধা এই যে, এই অজানা দেশে যেতে হলে কোন জোগাড়-যন্তর করতে হয় না। যখন ইচ্ছা হবে তখনই সেখানে যেতে পার; লোক নিতে হয় না, জন নিতে হয় না, ক্যাম্পখাট কিংবা বন্দুকেরও দরকার নেই। ম্যাপেরও দরকার নেই। এদেশে পথ হারাবারও ভয় নেই। আমাদের এই দেশভ্রমণে যেসব স্টেশন আসবে তা হচ্ছে এই:—জলের কল, স্টোভ, জিনিসপত্র রাখার জায়গা, হাঁড়ি কুড়ি রাখার সেল্‌ফ, কাপ-ডিস রাখার আলমারি, জামাকাপড়ের আলমারি।

জলের কল

প্রথম স্টেশন

মানুষ প্রথম কবে স্নান করতে আরম্ভ করেছিল ?

এমন শহর আজকাল নেই যেখানে জলের কল থাকে না। আমরা প্রত্যেকেই রোজ দশ-বারো বালতি জল খরচ করি। এই জলের কিছুটা যায় স্নান করতে, কিছুটা কাপড় কাচতে, কিছুটা বা জিনিসপত্র ধোয়ামোছা করতে। কিন্তু আগের দিনে বড় শহরের বাসিন্দারাও এক বালতির বেশী জল ব্যবহার করতে পারত না। অবশ্য এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কেন না আগে জলের এমন সুব্যবস্থা ছিল না। তখন বড়জোর জায়গায় জায়গায় কুয়ো থাকত, আর তা থেকে লোকে জল তুলে নিত। এ জলও আবার তেমন পরিষ্কার হত না। এমন প্রায়ই হত যে কেউ খাবার জন্য জল তুলে মুখের কাছে এনে দেখল তাতে একটা আস্ত ইঁদুর কি ব্যাঙ্ পচে গলে রয়েছে।

অবশ্য আগে যে শুধু জলেরই অভাব ছিল তা নয়, লোকের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে খুব ভাল ধারণা ছিল না। এই মাত্র কিছুদিন হল লোকে নিয়ম করে স্নান করতে শিখেছে। তিন শ বছর আগে রাজারাও রোজ স্নান করত না। ফ্রান্সের

রাজাদের বিলাসপূর্ণ শোবার ঘরে থাকত প্রকাণ্ড পালঙ্ক, তাতে পুরু গদির বিছানা—সে বিছানা পাততে লোকে হিম্‌সিম্ খেয়ে যেত। এজন্য তারা এক প্রকারের হাতিয়ার ব্যবহার করত—তার নাম শয্যা-যষ্ঠি। তার ওপরে সোনার কাজ-করা ঝালর বসানো মশারি চারটে সোনার কাজ-করা থামের ওপর ঝোলানো। ঘরের মেঝেতে দামী গালচে, এধারে ওধারে দামী ঘড়ি, আয়না, আরও কত কী! কিন্তু ফ্রান্সের সে সময়কার রাজপ্রাসাদের বর্ণনায় স্নানের ঘর বা স্নানের সরঞ্জামের উল্লেখ কোথাও নেই। রোজ ভোরবেলা রাজার কাছে একটা ভিজে তোয়ালে এনে হাজির করা হত, তাতেই রাজামশাই মুখ আর হাত মুছতেন। আর সকলের ধারণা ছিল এটাই যথেষ্ট।

শুধু স্নানের ব্যাপারে নয়, তখনকার দিনে জামা-কাপড় ধোয়ার বালাই ছিল না। বলতে কি লোকে কচিৎ জামা-কাপড় বদলাত। এমন কি বড়লোক বা শৌখীন লোকেরা মাসে একবার নয়তো বড়জোর দু'বার জামা বদলাতেন। জামা পরিষ্কার আছে কি না, সে সম্বন্ধে মাথা ঘামানো তাঁরা তেমন দরকার মনে করতেন না। তাঁরা ভাবতেন জামার হাতায় বসানো লেসগুলো বেশ দামী তো? জামার সামনের এমব্রয়ডারীটা বেশ ভাল তো? তা হলেই হল।……শোবার সময় অবশ্য তাঁরা সমস্ত জামা-কাপড় খুলে রেখে দিয়ে শুতেন। মাত্র দু'শ বছর থেকে মানুষ জামা-কাপড় বদলাবার কথা ভাবতে আরম্ভ করেছে।

রুমালের ব্যাপারেও তাই। অল্প দিনই রুমাল ব্যবহার

হতে আরম্ভ হয়েছে। খুব অল্প লোকেই তখন রুমাল ব্যবহার করত। মাত্র দু-তিন শো বছর আগেও খুব বড়লোকদের মধ্যে অনেকে রুমাল ব্যবহার বাবুগিরি বলে মনে করতেন।

ফ্রান্সের রাজার বিছানার ওপর যে মশারির কথা বললাম—তার উদ্দেশ্য ছিল যাতে ঘরের ছাদ থেকে ছারপোকা বা অন্য পোকামাকড় বিছানায় না পড়ে। কোন কোন প্রাচীন রাজপ্রাসাদে এখনও আমরা "ছারপোকার-ছাতা" দেখতে পাব। আর এসব রাজপ্রাসাদে ছারপোকাও থাকত লাখে লাখে। অবশ্য এই মশারিতে কতটা কাজ হত বলা যায় না, কেননা ঐ দামী মশারির কাপড়ের ভাঁজে ভাঁজে আর বিছানার চাদরের ফাঁকে কত ছারপোকা যে বাসা বাঁধত তার ইয়ত্তা নেই।

তখনকার দিনে অপরিষ্কার জল যাবারও কোনো ব্যবস্থা ছিল না। লোকে বালতি করে নোংরা জল ও আবর্জনা সোজা রাস্তায় ফেলে দিত; আর এই জল গিয়ে জমা হত রাস্তার মাঝখানের গর্তে। ঐ সব নোংরা জিনিস পচে এত খারাপ গন্ধ বেরোত যে রাস্তার লোকেরা যতদূর সম্ভব দেওয়ালের



গা ঘেঁসে চলত। এহেন সময়ে দেশে যে বেশী রোগ থাকবে তা আর আশ্চর্য কি? অবশ্য তখন লোকে জানত না যে অপরিচ্ছন্নতার জন্য রোগ হতে পারে। তা জানলে হয়তো

তারা সাবধান হত। ফলে প্রায়ই প্লেগ বা বসন্ত মহামারীর মতো এসে শহরকে শহর উজাড় করে দিত। হিসাব করে দেখা গিয়েছে, সে সময় যে সব শিশু জন্ম নিত তাদের দশজনের মধ্যে মাত্র পাঁচজন দশবছর পর্যন্ত বাঁচত। আর তখন রাস্তায় রাস্তায় বসন্ত বা কুষ্ঠরোগে বিকলাঙ্গ ভিখারির ছড়াছড়ি।

তোমাদের মনে এবার নিশ্চয়ই প্রশ্ন উঠবে, আজকাল আমরা যে বেশী স্বাস্থ্যবান হয়েছি তার মূলে কি আছে? এর উত্তর হচ্ছেঃ "জলের কল, সাবান আর পরিষ্কার জামা-কাপড়।

জল দিয়ে আমরা কাপড় ধুই কেন?

জল কি করে ময়লা ধুয়ে ফেলে? বোধ হয় যে রকম করে নদী ছোট ছোট পাথর স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে যায়



সেভাবে। বেশ একবার চেষ্টা করে দেখ। তোমার ময়লা হাতটা জলের কলের নিচে পাত। শুধু কি এতেই ময়লা পরিষ্কার

হয়ে যাবে? আমার মনে হয় না। ময়লা তুলতে হলে তোমার হাত দুটো রগড়াতে হবে।

কাপড় কাচবার সময় আমরা ঠিক তাই করি। ধোপারা যখন কাপড় কাচে, তখন তারা শুধু জল ঢালে না—তারা কাপড় আছড়ায়, নয়তো হাত দিয়ে রগড়ায়। কাগজ থেকে পেন্সিলের দাগ তুলতে হলে যেমন তাতে রবার দিয়ে ঘষতে হয়, কাপড় থেকে ময়লা তুলতে হলেও ঠিক তেমনি করে রগড়াতে হয়। ময়লা যখন এরকম করে উঠে যায় তখন জল দিয়ে কেচে ফেললেই কাপড় পরিষ্কার হয়ে গেল।

সাবানের ফেনার কাজ

অবশ্য এ পর্যন্ত আমরা একটা জিনিসের কথা বলিনি—যে জিনিসটা আমরা সর্বদা কাপড় ধুতে ব্যবহার করি। জিনিসটা কি বল তো? সেটা হচ্ছে সাবান। সাবান না মাখিয়ে কাপড় কাচলে বা সাবান না দিয়ে হাত ধুলে তাতে কিছু ময়লা থেকে যাবেই। সাবান হল ময়লার যম। যেমন ধরো ঝুল। ঝুল লাগলে সেটা শুধু জল দিয়ে পরিষ্কার করা যায় না। কেননা ঝুল হল কয়লারই খুব ছোট ছোট কণা, তার ওপর এর চারপাশটা অসমান। এগুলো আমাদের চামড়ায় যে অসংখ্য ছোট ছোট গর্ত আছে তার মধ্যে ঢুকে যায় আর বের হতে পারে না। কিন্তু একবার ভাল করে সাবান

মাখলে, সাবানের ফেনা ঐ ঝুলের ওপর লাগে আর চামড়ার ফুটো থেকে তাদের টেনে বার করে।

কোন সাবান সবচেয়ে ভাল পরিষ্কার করে? এটা ভাবা যাক। তোমরা জান, যে সাবানে সব চেয়ে বেশী ফেনা হয় সেই সাবানেই ময়লা তাড়াতাড়ি পরিষ্কার হয়। অর্থাৎ ফেনাটাই আসল জিনিস। এই ফেনাটা কি? এটা আর কিছুই নয়, ছোট ছোট সাবানের বুদ্বুদ—ছোট ছোট গোল জিনিস যার ভেতরে হাওয়া ভর্তি আর বাইরে সাবান-জলের পর্দা দিয়ে তৈরি। সাবান মাখবার সঙ্গে সঙ্গে ঝুলের টুকরোগুলোকে এই বুদ্বুদগুলো টেনে নেয়—কার্বনের ক্ষুদ্র কণিকাগুলি বুদ্বুদের গায়ে লেগে থাকে তারপর জল দিয়ে এই ফেনা ধুয়ে ফেলা তো সহজ ব্যাপার।

পাথরের মধ্য থেকে সোনা বা অপর মূল্যবান ধাতু বের করবার জন্য কারখানায় এই ব্যাপারই করা হয়। একটা বড় পাত্রে খুব খানিকটা সাবানের ফেনা রাখা হয়, আর তার মধ্যে পাথরের গুঁড়ো ফেলে দেওয়া হয়। সাবানের ফেনার জোর কম নয়। এরা পাথর থেকে ধাতুর টুকরোগুলোকে টেনে আলাদা করে ফেলে। গুঁড়োগুলো উপরে ভেসে ওঠে। তারপর শুরু হয় আসল বাছাই করার কাজ। ধাতুর সঙ্গে পাথর ও যে সব বাজে জিনিস থাকে তা এই সাবানের ফেনার গায়ে বেশীক্ষণ আটকে থাকতে পারে না—আস্তে আস্তে নীচে তলিয়ে যেতে থাকে। আসল ধাতু ওপরেই থেকে যায়। তখন সেগুলোকে তুলে নেওয়া মোটেই শক্ত নয়।

তাহলে দেখ, সাবানের ফেনা মোটেই খেলার জিনিস নয়, এটা কত ভাল কাজে লাগে। মানুষ বুদ্ধির জোরে এই সাধারণ জিনিসটিকেও কত দরকারী কাজে লাগিয়েছে।

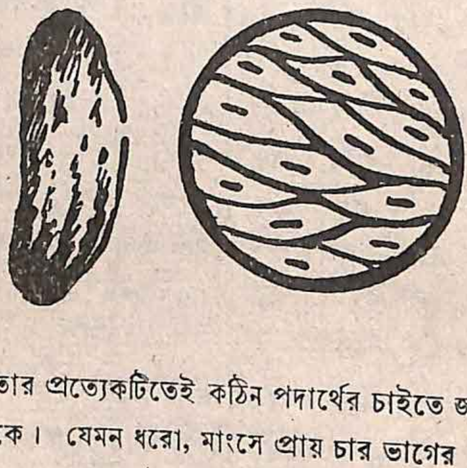
আমরা জল খাই কেন?

প্রশ্নটা বড্ড সোজা বলে মনে হচ্ছে, না? এত সোজা যে এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করাটাই বোকামি মনে হয়। কিন্তু একবার এই সোজা প্রশ্নটার উত্তর দিতে চেষ্টা করো তো দেখি? তোমাদের মধ্যে অনেকেই পারবে না। কেউ হয়তো উত্তর দেবে, "আমাদের জল খাওয়া দরকার তাই জল খাই।" কিন্তু এরও তো পাল্টা প্রশ্ন আছে। "কেনই বা খাওয়া দরকার? কারণ আমরা জল না খেয়ে বাঁচতে পারি না। কিন্তু কেন বাঁচতে পারি না? তার কারণ সর্বদাই আমাদের দেহে জল খরচ হয়ে যাচ্ছে, আর তাই সর্বদাই জলের অভাব পূরণ করতে হয়।

একখণ্ড ঠাণ্ডা কাঁচের পাতের ওপর নিঃশ্বাস ফেল। দেখবে কাঁচটা ঘেমে উঠল। সমস্ত কাঁচটার ওপর ছোট ছোট জলের বিন্দু ভর্তি। এই জল এল কোত্থেকে? এটা এল তোমার শরীর থেকে। কিংবা আর একটা জিনিস ধরো। গরমকালে তোমাদের প্রত্যেকেই অল্পবিস্তর ঘামো; এই জলটাই বা কোত্থেকে আসে? এটাও এসেছে ঐ একই জায়গা থেকে, তোমাদের শরীর থেকে। কিন্তু এই রকম করে যদি শরীরের সমস্ত জল বের হয়ে যায়, তা হলে আমাদের যেমন করে হোক

এই জলের ক্ষতিটা পুষিয়ে নিতে হবে। হিসাব করে দেখা গেছে মনুষ্য-শরীর থেকে এইভাবে দিনে প্রায় বারো গ্লাস জল বেরিয়ে যায়। এই জন্যই তাকে দিনে অন্তত বারো গ্লাস জল খেতে হবে।

জল খাওয়া মানে কি? শুধু ঢকঢক করে জল খেতে হবে এমন কোনো কথা নেই। আমরা মাছ, মাংস, তরিতরকারী



যা খাই তার প্রত্যেকটিতেই কঠিন পদার্থের চাইতে জল অনেক বেশী থাকে। যেমন ধরো, মাংসে প্রায় চার ভাগের তিনভাগই জল; আর শশা বা ঐ রকম ফলের প্রায় সবটাই জল। হ্যাঁ, আমাদের নিজেদের শরীরের অবস্থাটাও তাই। শশা বা কাঁকুড়ে জলের ভাগ যে পরিমাণ আমাদের শরীরে জলের অংশও ঠিক সেই রকম। ধরো, তোমার ওজন ৫৫ পাউণ্ড; এর মানে তোমার শরীরের ৪৮½ পাউণ্ডই কেবল জল আর বাকি ৬½ পাউণ্ড অন্যান্য শক্ত জিনিস। বয়স বাড়বার সঙ্গে

সঙ্গে জলের অংশ কমে যায়, তবু সব বয়সেই মানুষের শরীরে অন্তত চার ভাগের তিন ভাগ জল থাকে।

তোমাদের মনে হয়তো এই প্রশ্ন জাগবে, "আচ্ছা, আমাদের শরীরে যদি এত জল থাকে তবে আমরা শক্ত হয়ে দাঁড়াতে পারি কি করে? আমরা নেতিয়ে যাই না কেন?" এর উত্তর আছে। আমরা কি জিনিস দিয়ে তৈরি সেটা বড় কথা নয়; আসল কথা আমরা কি রকম করে তৈরি।

যদি অনুবীক্ষণ যন্ত্রের নীচে এক টুকরো মাংস বা এক টুকরো শসা রাখা যায়, তাহলে দেখবে ঐগুলো ছোট ছোট কোষ দিয়ে তৈরি। আর ঐ কোষগুলো জলে ভর্তি। অবশ্য এর মধ্যে যে জল আছে সেটা বের হয়ে যায় না, কারণ এই কোষগুলোর চারিদিকটা বেশ ভাল করে বন্ধ। এটাই হচ্ছে রহস্য। আমাদের শরীরের প্রধান গঠনবস্তু হচ্ছে জল। এবার নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ যে যদিও আমরা অনেকদিন না খেয়ে বাঁচতে পারি কিন্তু জলের অভাবে আমরা বেশীক্ষণ থাকতে পারি না, বাঁচতে পারি না।

জল কি ঘরবাড়ি উড়িয়ে দিতে পারে?

জল যে আমাদের খুব অনিষ্ট করতে পারে হঠাৎ দেখলে তা মনে হয় না। কিন্তু অনেক সময় বারুদের মতোই বিস্ফোরণ ঘটায় জল। বারুদের মতো? হ্যাঁ, তাই; ব্যবহার করতে না জানলে জল বারুদের চেয়েও বিশ গুণ বেশী ভয়ের জিনিস হয়ে দাঁড়াতে পারে। এই জলই একদিন আমেরিকার

একটা পাঁচতলা বাড়ি উড়িয়ে দিয়েছিল—আর তাতে সবশুদ্ধ পঁচিশজন লোক মারা যায়।

এই অনর্থ কি করে হয়েছিল জান? এই বাড়িটায় একটা কারখানা ছিল। আর তাতে ছিল একটা বড় আগুনের চুল্লী ও একটা প্রকাণ্ড বয়লার—এই বয়লারে একটা ছোট-খাটো পুকুরের সমস্ত জল ধরত। এই বয়লারে জল গরম হয়ে যে বাষ্প হত তা কয়েকটা নলের ভেতর নিয়ে ইঞ্জিনের মধ্যে যেত আর এই বাষ্পের জোরে কল চলত। একদিন কারখানার মেসিন-চালক ঠিক সময়ে বয়লারে জল দিতে ভুলে গেল। এদিকে আগুন সমানে জ্বলছে—দেখতে দেখতে বয়লার তেতে লাল হয়ে উঠল। চালক এসব কিছু লক্ষ্য না করে, একটু পরে বয়লারে জল ঢেলে দিল।

তোমরা জান গরম লোহায় জল ফেললে জল তখনই বাষ্প হয়ে যায়। এখানেও তাই হয়েছিল। বয়লার তেতে লাল হওয়ায় জল ঢালা মাত্র তাতে এত বাষ্প হল যে বয়লারও সে চাপ সহ্য করতে পারল না। ফলে বয়লার ফেটে গেল। জার্মানিতে একবার এর চেয়েও ভয়ঙ্কর একটা বিস্ফোরণ হয়েছিল। একসঙ্গে কুড়িটি বয়লার ফেটে গিয়েছিল। কাছাকাছি সমস্ত বাড়ি ভেঙে গিয়েছিল, বয়লারের ভাঙা টুকরো এক মাইল দূর পর্যন্ত ছুটে গিয়েছিল।

তাহলেই দেখছ বাষ্প কি সাংঘাতিক জিনিস!

তোমাদের নিজেদের বাড়িতে রোজই হাজার হাজার বয়লার এই রকম করে ফাটছে। তবে ভরসার কথা এই যে,

এই বয়লারগুলো নেহাত ছোট ছোট। যেমন ধর, কাঠ পুড়বার সময় যে পট পট করে শব্দ হয় সেটা আর কিছুই নয়, কাঠে যে জল থাকে, তা আগুনের তাপে বাষ্প হয়ে কাঠ ফেটে বেরিয়ে আসে। সেই শব্দই তোমরা শোন।

জমাট জল

বাষ্প যেমন হঠাৎ ফেটে গিয়ে অনর্থ বাধায় জমাট জল বা বরফও এই রকম মাঝে মাঝে জিনিস ভেঙে-চুরে তছনছ করে দেয়। তবে বাষ্প ভাঙে বাড়িঘর আর বরফ ভাঙে পাহাড় পর্বত। কি করে এটা হয়? পাহাড়ের গর্তে বৃষ্টির সময় যে জল জমে তা শীতে বরফ হয়ে যায়। কিন্তু জল যেটুকু জায়গা নেয়, বরফ তার চেয়ে বেশী জায়গা নেয়। অবশ্য খুব বেশী নয়, দশ ভাগের একভাগ বেশী। এই বরফের চাপ সব দিকেই সমান ভাবে পড়ে; এই চাপে পাহাড়ও ফেটে চৌচির হয়ে যায়। এইজন্য যে জায়গায় শীত খুব বেশী সেখানে মাঝে মাঝে জলের কলের পাইপ ফেটে যায়। এই জন্যই শীতের জায়গায় শীতকালে পাইপে বেল্ট জড়ানো হয়।

মেঝের উপর স্কেটিং করা যায় না কেন?

মেঝের উপর স্কেটিং করা যায় না কেন জিজ্ঞাসা করাতে একটি ছেলে বলল: "বরফ হচ্ছে শক্ত ও পিছল, মেঝে তো তা নয়, তাই বরফের উপর স্কেটিং চলে।"

কিন্তু পাথরের তৈরি মেঝেও তো শক্ত ও পিছল। কিন্তু তাতেই বা কি স্কেটিং চলে!

আসলে বরফের উপর স্কেটিং করার সময়, স্কেটের চাপে বরফ গলে যায়। স্কেট আর বরফের মাঝখানে একটা জলের স্তর তৈরি হয়ে যায়। এর জন্যেই স্কেটিং করা যায়, না হলে মেঝের মতোই অবস্থা হত। জলে স্কেটের তলাটা পিছল হয়ে যায়, যেমন মেশিনে হয় তেল দিলে।

ঠিক এই কারণেই পাহাড়ের উপর দিয়ে গ্লেসিয়ার নামে, বরফের চাপে নীচের বরফ গলে যায় ও পাহাড়ের ঢালু দিয়ে নেমে যায়—ঠিক স্কেটের মতোই।

সব সময়ে কি জল স্বচ্ছ, আর লোহা অস্বচ্ছ?

জল সাধারণত স্বচ্ছ বলেই মনে হয়—জলের ভেতর দিয়ে সব কিছুই দেখা যায়। কিন্তু সমস্ত জলই এরকম নয়। আসলে জলের উপরিভাগ শুধু স্বচ্ছ; এই জন্যেই সমুদ্রের নীচে এত অন্ধকার, সূর্যের আলো জলের এত ঘন স্তর ভেদ করে নীচে পৌঁছুতে পারে না।

আসলে শুধু যে জলই স্বচ্ছ তা নয়। যদি খুব পাতলা পাত তৈরি করা যায় তো সব জিনিসই স্বচ্ছ হবে। একটা পরিষ্কার স্বচ্ছ কাঁচ নিয়ে তার এক ধার দিয়ে চেয়ে দেখ। দেখবে কাঁচটা তেমন স্বচ্ছ মনে হচ্ছে না। কয়েক বছর আগে একজন বৈজ্ঞানিক লোহার একটা পাতলা পাত তৈরি করেছিলেন এক মিলিমিটারের লক্ষ ভাগের এক ভাগ পুরু।

এই পাতটা লোহার তৈরি হলেও ছিল কাঁচের মতো স্বচ্ছ—এবং প্রায় বর্ণহীন খোলা বইয়ের পাতার ওপর রাখলে বইয়ের লেখা পড়তে কিছুই অসুবিধা হত না। সোনা আর অন্যান্য ধাতু দিয়েও এখন এই রকম পাত তৈরি করা হয়েছে।

রান্নার উনুন

দ্বিতীয় স্টেশন

মানুষ কবে প্রথম আগুন জ্বালাতে শিখল ?

শীতের সন্ধ্যায় উনুনে আগুন কেমন চমৎকার জ্বলে তোমরা সবাই দেখেছ। জ্বলন্ত আগুনের দিকে তাকিয়ে তোমাদের হয়তো অনেক কথাই মনে হয়—বাড়িতে আগুন লাগার কথা, শহর পুড়ে যাওয়ার কথা, দুর্গ অবরোধের কথা।···কাঠ যখন জ্বলতে জ্বলতে শব্দ করে ফেটে যায় তখন তোমাদের নিশ্চয়ই বন্দুকের শব্দের কথা মনে হয়। আগুনের শিখা দেখলে মনে হয় দুর্গের দেয়ালে সৈন্য চলাচলের কথা।

অনেক অনেক দিন আগে লোকের বিশ্বাস ছিল যে, একরকম ছোট ছোট আগুনে টিক্‌টিকির জন্যই এই আগুন জ্বলে। এই টিক্‌টিকিগুলোর গা দিয়ে আগুন বের হয়, আর এরাই হল আগুনের দেবতা। আগুনকে দেবতা বলে পুজো মানুষ অনেক দিনই করে আসছে—এখনও করে। আগেকার দিনে অনেক জায়গায় এই রকম অগ্নিদেবের উদ্দেশ্যে গড়া মন্দির ছিল—এ মন্দিরগুলোতে সর্বদা আগুন জ্বালিয়ে রাখা হত। এই সারাক্ষণ আগুন জ্বালিয়ে রাখাটা পৃথিবীর একটা পুরানো প্রথা। হাজার হাজার বছর আগে লোকে আগুন জ্বালাতে

শেখেনি—তবে তারা যে আগুন দেখেনি এমন বলা যায় না। তাই আগুন পেলে তাকে তারা মূল্যবান সম্পদের মতোই রক্ষা করত। কারণ একবার এই আগুন যদি নিভে যায় তবে তারা তা আর পাবে না। তারা জানত না আগুন কি করে জ্বালাতে হয়। এর থেকেই সারাক্ষণ আগুন জ্বালিয়ে রাখার প্রথার উৎপত্তি।

বাজ পড়ে অনেক সময় গাছে আগুন ধরে যেত। দূর থেকে মানুষ ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে দেখত কেমন করে একটার পর একটা গাছে আগুন ধরে যায়, লক লক করে আগুনের শিখা আকাশের দিকে ওঠে আর সেই সঙ্গে কাঠ ফাটার শব্দ। লোকে কাছে যেতে সাহস পেত না; কিন্তু মনে করত আগুন বেশ তো গরম! শীতের রাতে তো বেশ লাগে!

আদিম যুগের মানুষ ছিল সাহসী জীব: তা না হলে তাকে আর বেঁচে থাকতে হত না, কারণ প্রায়ই বিরাট বিরাট লোমশ ম্যামথ ও ভয়ংকর ভল্লুকের সঙ্গে লড়াই করতে হত। বোধহয় এক বে-পরোয়া মানুষ একদিন সাহসে ভর করে আগুনের কাছে এগিয়ে একটা জ্বলন্ত কাঠ নিয়ে এসেছিল। কে এই আদিম মানুষ যে সাহস করে একদিন এমন এক অপূর্ব সম্পদ জয় করে ঘরে নিয়ে এল ইতিহাস তার খোঁজ রাখে না। সম্ভবত একজন মানুষ এ কাজ করেনি, পৃথিবীর নানা অংশে এরকম অনেকেই হয়তো এ কাজ করেছে। মোটের উপর খুব সাহসী লোকেই আগুনকে আয়ত্তে এনেছে। এ যেন বুনো জন্তুকে পোষ মানানোর মতো।

এই আগুন নিয়ে আসার ইতিহাস শুনে তোমরা হয়তো ভাববে, এ আর এমন কি শক্ত কাজ। তোমরা জানো এডিসন সাহেব সর্বপ্রথম ইলেকট্রিক আলো আবিষ্কার করেন।



তোমরা শুনে আশ্চর্য হবে যে সে যুগের দীর্ঘবাহু বুনো পশুর চামড়া পরা মানুষের আগুন আবিষ্কারের সঙ্গে তুলনা করলে এডিসনের আবিষ্কার নেহাত তুচ্ছ। আমাদের সঙ্গে গরিলা আর ওরাং-ওটাং-এর যে পার্থক্য আজ রয়েছে তার মূলে হল এই আগুন আবিষ্কার।

এইভাবে আদিম মানুষের গুহা ও মাটির ঘর আগুনের আলো দেখল। কিন্তু আগুনের খোঁজ পাওয়া আর আগুন জ্বালাতে শেখার মধ্যে হাজার হাজার বছর পার হয়ে গিয়েছে। আর, একবার জ্বালাতে শিখলে আর কোনো ভয় নেই। বাতাসে বা বৃষ্টিতে আগুন নিভে গেলে আবার জ্বেলে নেওয়া যায়।

কিন্তু জ্বালাতে শেখার পরও আদিম কালের কথা মনে করে মানুষ অনেকদিন পর্যন্ত মন্দিরে আলো জ্বালিয়ে রাখত।

একটা কথা বল্লে হয়তো আশ্চর্য লাগবে। তখনকার লোকের আগুন জ্বালাবার প্রথা আর এখনকার লোকের আগুন জ্বালাবার প্রথা দুইই মূলত একরকম। আগে মানুষ একটা কাঠ আর একটা কাঠের সঙ্গে ঘষে আগুন জ্বালাত। এখনও

মানুষ এই রকম করেই আগুন জ্বালে—একটা দেশলাই-এর কাঠি দেশলাই-এর বাক্সের সঙ্গে ঘষে।

অবশ্য এই দুটো প্রথাতে তফাতও আছে অনেক। দেশলাই জ্বালাতে এক মুহূর্তের বেশী সময় লাগে না কিন্তু কাঠ ঘষে ঘষে আগুন জ্বালাতে পাঁচ মিনিটেরও বেশী সময় লাগে। তোমাদের সকলেই দেশলাই জ্বালাতে পার কিন্তু তোমাদের কেউ কি সেই আগের নিয়মে আগুন জ্বালাতে পারবে? চেষ্টা করে দেখতো! হয়তো পারবেই না।

দেশলাই জ্বলে কেন?

আদিম মানুষের আমাদের মতো যন্ত্রপাতি ছিল না। তাদের না ছিল করাত, না ছিল প্লেন করার যন্ত্র। করাত বা প্লেন করার জন্যও সে ব্যবহার করত হাড়ের বা পাথরের টুকরো। তা দিয়ে কাজ করা মোটেই সহজ ছিল না। কাঠ কেটে প্লেন করতে হলে তাকে অনেকক্ষণ ধরে পাথরের সঙ্গে ঘষতে হত। ঘষতে ঘষতে কাঠ তেতে আগুন হয়ে উঠত। বোধ হয় এমনি করেই একদিন ঘষতে ঘষতে কাঠে হঠাৎ আগুন ধরে উঠেছিল। মানুষ এ থেকেই আগুন জ্বালাতে শিখেছে। কিন্তু খুব তেতে না উঠলে আগুন জ্বলে না। কাজেই দুটো কাঠের টুকরো ঘষে আগুন জ্বালাতে হলে বেশ কিছুক্ষণ ধরে ঘষতে হয়।

দেশলাই-এর ব্যাপার কিন্তু একেবারে অন্যরকম। দেশলাই-এর কাঠির আগায় এমন একটা জিনিস লাগানো থাকে যা সামান্য একটু গরমেই জ্বলে ওঠে। একটা গরম লোহার উপর

কিংবা স্টোভের মুখে দেশলাই-এর কাঠির বারুদের দিকটা ধরো, ছোঁয়াতে না ছোঁয়াতেই দপ করে জ্বলে উঠবে। কাঠির উল্টো দিকটা ধরে কিছুই হবে না। এই জন্যই দেশলাই জ্বালাতে হলে আমাদের কাঠিটা দেশলাই-এর বাক্সের উপর পাঁচ মিনিট ধরে ঘষতে হয় না। দু'একবার ঘষলেই আগুন জ্বলে ওঠে।

কখন দেশলাই আবিষ্কার হয়?

বেশীদিন হল দেশলাই-এর আবিষ্কার হয়নি—এই ১৯৩৩ সালে মাত্র তার জন্মের শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন করা হল। এর আগে আগুন জ্বালাবার অন্য রকম যন্ত্র ছিল। এই একশ বছরের কিছু আগে লোক দেশলাই-এর বদলে পকেটে একটা ছোট বাক্স নিয়ে বেড়াত। এই বাক্সে থাকত ছোট ছোট তিনটে জিনিস, একটা ইস্পাতের টুকরো, একখণ্ড চকমকি পাথর আর কিছুটা সোলার মতো জিনিস। এই ছিল তখনকার দিনের দেশলাই।

এই রকম 'দেশলাই' জ্বালায় কি করে? এটা দিয়ে আগুন জ্বালাতে হলে এক হাতে নিতে হয় ইস্পাতের টুকরো আর অন্য হাতে সোলা আর পাথর। এইবার পাথর ও ইস্পাতের টুকরো দুটো দিয়ে কয়েকবার ঠোকাঠুকি করতে করতে হয়তো একটা আগুনের ফুলকি বের হল—সেটা যদি ঠিক-মতো সোলার ওপর পড়ে তো আগুন জ্বলবে—নয় তো আবার চেষ্টা করতে হবে। চারবার কি পাঁচবার চেষ্টা করে তবে আগুন জ্বলল।

এই আগুন জ্বালাবার পদ্ধতি আর আধুনিক সিগারেট লাইটারের পদ্ধতি একেবারে এক রকম। চকমকি দেশলাই-এর মতো এতে একটা ছোট পাথর আছে। আরো আছে



একটা ইস্পাতের চাকার মতো—আর সোলার বদলে এতে থাকে পেট্রোলে ভেজানো একটা সল্‌তে।

তা হলেই বুঝতে পারছ, আগুন জ্বালানো সোজা ব্যাপার



নয়। অথচ ইউরোপের লোকেরা যখন গ্রীনল্যাণ্ডের এস্কিমোদের দেশলাই-এর ব্যবহার শেখাতে আরম্ভ করেছিল তখন তারা তাতে রাজী হল না। তারা মনে করে তাদের নিয়মই

ভাল। তাদের আগুন জ্বালাবার নিয়মটা হচ্ছে চামড়ার সাঁড়াশির সাহায্যে একটা কাঠের ওপর আর একটা কাঠ ঘষে।

অবশ্য ইউরোপের লোকেরাই কি সহজে তাদের এই চকমকি দেশলাই-এর ব্যবহার ছাড়তে চেয়েছিল? অনেকদিন পর্যন্ত ইউরোপে নানা রকম অদ্ভুত ধরনের দেশলাই-এর চলন হয়েছিল। কোনটাতে দেশলাই-এর কাঠি সালফিউরিক অ্যাসিডে ডোবাতে হত, কোন দেশলাই-এর কাঠির মাথাটা আবার কাঠের তৈরি থাকত, জ্বালাতে হলে একটা চিমটে দিয়ে এর মাথাটা ভেঙে ফেলতে হত। এক রকম দেশলাই আবার সবটা কাচ দিয়ে তৈরি ছিল। এই সব দেশলাই-এর ব্যবহার যে শুধু কঠিন ছিল তা নয়—এ দেশলাই বেশ দামীও ছিল।

এ-ভাবে অনেকদিন কেটে গেল—তারপর এল ফসফরাস-দেওয়া দেশলাই। ফসফরাস হল একরকম জিনিস যা সামান্য তাপে জ্বলে ওঠে—১৪০° ফারেনহিটেই জ্বলে ওঠে। তোমরা নিশ্চয়ই ভাবছ এর চেয়ে ভাল জিনিস দেশলাই-এর জন্য আর হয় না। কিন্তু আগেকার ফসফরাসের দেশলাই এখনকার দেশলাই-এর তুলনায় অনেক খারাপ। প্রথমত ফসফরাস জিনিসটা হল বিষাক্ত, তাছাড়া ওটা বড় সহজেই জ্বলে ওঠে—খুব নরম চামড়া বা দেয়ালের সঙ্গে সামান্য ঘষা লাগলেই জ্বলে ওঠে। দেশলাই জ্বালাবার সঙ্গে সঙ্গে একটা বিস্ফোরণের মতো হত, আবার বারুদের টুকরোগুলো ছোট বোমার মতো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ত। তাছাড়া জ্বলবার পর সালফিউরাস গ্যাসের দুর্গন্ধে জায়গাটা ভরে যেত।

দেশলাই-এর মাথায় সালফার ও ফসফরাস দুই-ই থাকত আর জ্বলবার পর তা সালফার-ডায়কসাইডে পরিণত হয়।

প্রায় ষাট বছর আগে আজকালকার ধরনের "সেফ্‌টি" বা "সুইডিস" দেশলাইএর প্রথম আবির্ভাব হয়। এতে ফসফরাস নেই, গন্ধকও নেই। অন্য জ্বালানী বস্তু এতে ব্যবহার করা হয়। কাজেই এগুলো বেশ নিরাপদ আর এতে বিষাক্তও কিছু নেই।

জল জ্বলে ওঠে না কেন?

তোমরা জান এমন কতগুলো জিনিস আছে যা খুব গরম না করলে জ্বলে না। কতগুলো সামান্য গরম হতে না হতেই জ্বলে ওঠে। আবার এমন অনেক জিনিস আছে যা একেবারেই জ্বলে না। যেমন ধরো জল—জল কখনও জ্বলে না। কিন্তু কেন?



এর উত্তর খুব সোজা। ছাই যে জন্য জ্বলে না, জলও সেজন্য জ্বলে না। কারণ আগুনে পুড়েই তবে জল তৈরি হয়!

কিন্তু কোন্ জিনিস সেটা যাকে পোড়ালে তবে জল পাওয়া যায়? এক রকম গ্যাস—তাকে হাইড্রোজেন বলে, যে গ্যাস বেলুনে ভরে দেওয়া হয়—সেই গ্যাস পোড়ালে তবে জল তৈরি হয়।

আমেরিকায় আজকাল হাইড্রোজেনের বদলে হিলিয়াম বলে আর এক রকম গ্যাস বেলুনে ব্যবহার করে। এই হিলিয়াম গ্যাস জ্বলে না—কাজেই হিলিয়াম গ্যাসে ভরা বেলুনে ভয় কম।

উনুনে পোড়ালে কাঠের অবস্থা কি হয়?

কাঠের গোলা থেকে এক বোঝা কাঠ তোমরা আনলে এবং শব্দ করে মেঝেতে ফেললে। কাঠের টুকরোগুলো বেশ বড় বড়। কাঠের গন্ধে ঘর ছেয়ে গেল। উনুনে কাঠগুলো দিয়ে আগুন জ্বালালে। আধঘণ্টা পরে যদি চেয়ে দেখ—কি দেখবে? কাঠের আর কিছুই নেই; পড়ে আছে শুধু একটু ছাই আর মেঝেতে খানিকটা দাগ।

কাঠের গাদা গেল কোথায়? পুড়ে গিয়েছে। "পুড়ে যাওয়া" মানে কি? ব্যাপারটা ভাল করে বুঝতে হবে। মোমবাতি জ্বলে গিয়ে উবে যায়। সত্যি কি মোমবাতি উবে যায়? না, এইরকম শুধু মনে হয়?

এটা বুঝতে হলে একটা কাজ করতে হবে। একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে তার ওপর একটা চামচে উপুড় করে ধরো। দেখবে চামচেটা কালো হয়ে যাবে আর তার মধ্যে ছোট্ট

ছোট্ট কয়েক ফোঁটা জল। এই জলটা এল কোথা থেকে? নিশ্চয়ই মোমবাতির শিখা থেকে। তাছাড়া অন্য কোথা থেকেই বা আসবে? এইবার চামচেটা পরিষ্কার করে আবার বাতির ওপর ধরো। দেখবে এবার চামচেতে ভুষো পড়ছে। এই ভুষো এল কোত্থেকে? আবার ঐ মোমবাতি থেকেই।

এবার হয়ত তোমরা জিজ্ঞাসা করবে—মোমবাতিতে যদি জল আর ভুষো থাকে তো আগে আমরা দেখতে পাই না কেন? উত্তর খুব সোজা। বাড়ি তৈরি করতে অনেক কড়ি, বরগা ইত্যাদি লেগেছে, অথচ এখন কিছুই দেখা যাচ্ছে না। বাড়িটা যদি পুড়ে যায় তাহলে ঐ কড়ি বরগা ইত্যাদি আবার দেখা যাবে। আর তখন এই কড়ি, বরগা আর পেরেকের রাশি ছাড়া আর অন্য কিছুই দেখতে পাবে না। সেই রকম মোমবাতি যখন পুড়িয়ে ফেলা হয়, তা থেকে আমরা ঐ ভুষো আর জল ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাই না।



তা হলে ব্যাপার দাঁড়ালো এই যে, মোমবাতি জ্বালালে তা থেকে আমরা পাই জল আর কালি অর্থাৎ কার্বন (Carbon), এগুলো যায় কোথায়? জলটা বাষ্প হয়ে বাতাসের সঙ্গে মিশে যায়, মোমবাতির উপরে চামচ ধরলে তাতে যে জলকণা জমেছিল ঠিক এইজন্যই। আর কার্বন বাড়ির দেওয়ালে, সিলিং-এ বা আসবাবপত্রের গায়ে লাগে। তবে মোমবাতি

যখন খুব ভাল করে জ্বলে তখন তাতে কালি পড়ে কম। কারণ কার্বনটা সবই পুড়ে গিয়েছে। কিন্তু "পুড়ে গিয়েছে" মানে কি?

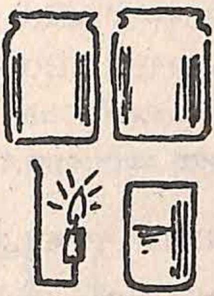
আবার প্রথম থেকে শুরু করতে হবে। পুড়ে গেলে কার্বনের কি হয়? দুটোর একটা হতেই হবে: হয় এটা ফুরিয়ে যায়, আর না হয় এটা অন্য কোনো জিনিসে পরিবর্তিত হয়ে যায়, যে জিনিসকে আমরা দেখতে পাই না।

চল, আমরা এই ভূতুড়ে জিনিসটা ধরবার চেষ্টা করি।

এর জন্য আমাদের কয়েকটা জিনিস দরকার; দুটো বড় বড় জার, যাতে করে তোমাদের বাড়িতে আচার টাচার রাখে আর কি। একটা মোমবাতি যার পিছনে একটা তার এমনভাবে লাগানো যেন এই তারটা ধরে মোমবাতিটাকে জারের মধ্যে ওঠানো নামানো যায়। আর চাই এক গ্লাস চুনের জল। এই চুনের জল তৈরি করার নিয়ম আছে। খানিকটা জলে একটুখানি চুন গুলে সেটা ব্লটিং কাগজ দিয়ে ছেঁকে ফেলতে হবে—যদি একবার ছেঁকে একটু ঘোলা মনে হয় তাহলে সেটাকে আবার ছাঁকতে হবে, যতক্ষণ না স্বচ্ছ টলটলে জলের মতো দেখায়।

এইবার মোমবাতিটা জ্বালাও। তারপর তার দিয়ে ধরে আস্তে আস্তে একটা জারের মধ্যে নামিয়ে দাও। মোমবাতিটা জ্বলতে জ্বলতে এক সময়ে নিভে যাবে। বাতিটা বের করে আবার জ্বালাও, তারপর ঐ জারের ভেতর আবার নামিয়ে দাও। এবার নামাতে না নামাতে বাতিটা নিভে

যাবে, ঠিক জলে ডুবিয়ে দিলে যেমন হয়। এর থেকে প্রমাণ হয় যে ঐ জারে এখন এমন একটা জিনিস আছে যার জন্যে



বাতিটা নিভে যাচ্ছে। অথচ খালি চোখে জারের মধ্যে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। এই জিনিসটা তাহলে কি ?

এবার একটা কাজ করো। ঐ চুনের জলটা ঐ জারের মধ্যে ঢালো। দেখবে জলটা একটু একটু ঘোলা হতে হতে শেষে একেবারে দুধের মতো সাদা হয়ে যাবে। ঐ চুনের জলই যদি অন্য জায়গাটায় ঢালা হয় তো তার কোনো পরিবর্তন হয় না। এ থেকেই বোঝা যায় যে ঐ জারে এমন একটা অদৃশ্য গ্যাস তৈরি হয়েছে যাতে চুনের জল ঘোলাটে হয়ে যায়। বৈজ্ঞানিকেরা এই গ্যাসের নাম দিয়েছেন কার্বন ডায়ক্সাইড (carbon dioxide)। যখনই carbon বা অঙ্গার আছে এমন কোনো জিনিস জ্বালানো হয় তখনই এই গ্যাস তৈরি হয়। এইবার তোমরা হয়তো বুঝতে পারছ, মোমবাতির কার্বন কোথায় যায়। সেটা এই ডায়ক্সাইড গ্যাস হয়ে বেরিয়ে যায়।

কাঠ জ্বললেও তাই হয়। কাঠ পুড়ে জল ও কার্বনে

পরিণত হয়। কার্বনটা পুড়ে যায়—অবশ্য সবটা নয়। কিছুটা না-পোড়া কার্বন উনুনে থেকে যায়। কিন্তু যে কার্বনটা পুড়ে যায় অর্থাৎ যেটা কার্বন ডায়ক্সাইডে পরিণত হয়, সেটা জলীয় বাষ্পের সঙ্গে চিমনি দিয়ে বেরিয়ে যায়। সাদা ধোঁয়া যেটা বেরোয় সেটা হচ্ছে এই জলীয় বাষ্প। ধোঁয়াটা কালো হলে বুঝতে হবে তার সঙ্গে না-পোড়া কার্বন যথেষ্ট রয়েছে।

উনুন জ্বালালে শব্দ হয় কেন?

তোমরা দেখেছ উনুনে আগুন দিলে কেমন এক রকম শব্দ হয়—যত বেশী আগুন জ্বলে শব্দও তত জোর হয়। এই শব্দ কোথা থেকে আসে?

তোমরা দেখেছ বাঁশীতে ফুঁ দিলে শব্দ হয়? কিন্তু উনুনে তো কেউ ফুঁ দিচ্ছে না। ব্যাপারটা হয় এই রকম।

আগুন জ্বালার সঙ্গে সঙ্গে চারপাশের বাতাস গরম হয়ে ওঠে। তোমরা জানো, গরম বাতাস ঠাণ্ডা বাতাসের চেয়ে হাল্কা। বাতাস গরম হবার সঙ্গে সঙ্গে চারপাশের ঠাণ্ডা বাতাস আগুনের দিকে ছুটে আসে আর গরম বাতাস ওপরে উঠে যায়। তাই সর্বদাই উনুনের মধ্যে একটা বাতাসের স্রোত বয়ে যাচ্ছে। এর জন্যই ঐ রকম শব্দ হয়।

এটা পরীক্ষা করে দেখতে পার সহজেই।

একটা পোস্টকার্ড বা তাসের একধারে কতগুলো কাগজের টুকরো রাখ। এইবার পোস্টকার্ডটি উনুনের উপর ধরো। কাগজগুলো উড়ে যাবে।

কে তাদের ভিতরে ঠেলে দিচ্ছে? ঘরের বাতাসই কাগজের টুকরোগুলোকে টেনে নিচ্ছে যেমন করে স্রোত টেনে নেয় কাঠের কুটিগুলোকে। কেউই স্টোভে ফুঁ দিচ্ছে না, বাতাস নিজেই ছুটছে।

কিন্তু সত্যিই কি বাতাস গরম হলে উপরে উঠে যায়? নিজের চোখেই এটা দেখতে পার। খুব রোদ্দুরের দিনে



জানালার কাছে একটা বাতি বা লণ্ঠন রাখো। ভাল করে দেখলে দেখবে জানালায় গরম বাতাসের ছায়া পড়বে—যেন আবছা আবছা কি যেন ক্রমশ ওপরের দিকে উঠে যাচ্ছে। এইজন্যই আগুনের শিখা সর্বদা ওপরের দিকে ওঠে—গরম বাতাস ওপরে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আগুনের শিখাকেও নিয়ে যায়।

এই সঙ্গে একটা কথা মনে রাখা ভাল। বাতাস না পেলে আগুন জ্বলে না। তাই উনুনের নীচেও বাতাস যাবার

পথ রাখতে হয়, উনুনের দরজায়ও ফুটো রাখতে হয়। বাতাস যত জোরে বয় আগুনও তত জোরে জ্বলে।

জল দিয়ে আগুন নেভানো যায় কেন?

এবার হয়তো তোমরা বলতে পারবে, জলে বাতি ডুবিয়ে দিলে বাতি নিভে যায় কেন। মোমবাতি জ্বালাতে হলে বাতাসের দরকার। জলে ডোবালে মোমবাতি আর বাতাস পায় না। কাজেই নিভে যায়। অন্য এক উপায়েও আগুন নেভানো যায়—একটা কম্বল চাপা দিলে বা বালি ঢেলে দিলে আগুন নিভে যায়। এর কারণ ঐ একই। চাপা দেওয়ার জন্য আর বাতাস আগুনের কাছে পৌঁছতে পারে না।

আমরা ফুঁ দিয়ে দেশলাই নেভাই কেন?

একটা জ্বলন্ত দেশলাই-এর কাঠি নেভাবার জন্য কিন্তু আমরা জলও ঢালি না বা কম্বল চাপাও দিই না—শুধু জোরে ফুঁ দিলেই দেশলাই নিভে যায়। কিন্তু এর কারণ কি?

দেশলাই জ্বালাবার জন্যে দেশলাই-এর কাঠি গরম করতে হয়। তাই বাক্সের উপরটা ঘষতে হয় অথবা কোনো গরম জিনিসের সঙ্গে ছোঁয়াতে হয়। দেশলাই নেভাতে গেলে কি করতে হয়? দেশলাই-এর কাঠিটাকে ঠাণ্ডা করতে হয়। জোরে ফুঁ দিলে কাঠিটা ঠাণ্ডা হয় দেশলাই নিভে যায়।

একটা ধাঁধা

এবার একটা ধাঁধার জবাব দাও। একটা উনুন সর্বদা

জ্বলছে, তাতে বাতাস আছে আবার ধোঁয়া বের হয়ে আসছে ; অথচ তাতে কোনো আগুন নেই। এই উনুনটা কি ?



এই জিনিসটা হচ্ছে মানুষ।

প্রশ্বাসের সঙ্গে আমরা বাতাস নিই, আর নিঃশ্বাসের সঙ্গে জল আর কার্বন ডায়ক্সাইড গ্যাস বার করে ফেলি ঠিক উনুনেরই মতো।

আমাদের নিঃশ্বাসে যে জল আর কার্বন ডায়ক্সাইড আছে তা প্রমাণ করা সোজা। নাকের কাছে একটা পরিষ্কার চামচে নিয়ে তাতে নিঃশ্বাস ফেলো—চামচেটা ঘেমে উঠবে। আবার একটা নল দিয়ে এক গেলাস চুনের জলে ফুঁ দাও, চুনের জল সাদা হয়ে যাবে। এর থেকেই প্রমাণ হয় নিঃশ্বাসে কার্বন ডায়ক্সাইড আছে।

আমাদের মুখটাই উনুনের দরজা ও চিমনি দুইয়েরই কাজ করছে। খাদ্যই হচ্ছে এ উনুনের জ্বালানি। জ্বলন্ত উনুনের মতোই তাই আমাদের শরীর সর্বদা গরম।

রান্নার সরঞ্জাম

তৃতীয় স্টেশন্

রান্নাঘর না বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগার?

শুকনো কাঠগুলো উনুনের মধ্যে জলবার সময় ফট্ ফট্ করে শব্দ করে। আগুনের শিখাগুলো যেন নাচতে থাকে। উনুনের উপর চাপানো কেটলির ঢাকনাটাও লাফিয়ে লাফিয়ে ওঠে। উনুনের কড়াটা যেন আনন্দে নাচতে থাকে। এমন কি বড় পেতলের সস্‌প্যানটাও সশব্দে ফুটন্ত জল চারিদিকে ছড়াতে থাকে। এই হচ্ছে রান্নাঘর। কিন্তু সত্যিই কি একটা রান্নাঘর? না একটা ল্যাবরেটারী?

ঠিক ল্যাবরেটারীর মতোই সাধারণ জিনিসগুলো রান্না-ঘরে এসে যেন একেবারে অন্য জিনিস হয়ে যায়।



সস্‌প্যান, কড়া, কেটলিতে অদ্ভুত সব ব্যাপার ঘটতে থাকে। ছোট ছোট জিনিস ক্রমশঃ ফুলে উঠে সস্‌প্যানের কানা

পর্যন্ত উঠে যায়। যারা মাংস রান্না হতে দেখেছ তারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ কাঁচা মাংস রান্না হবার এক ঘণ্টার মধ্যে কেমন একেবারে বদলে যায়। আগের মাংস তখন আর চেনাই যায় না। মাংস গলে গিয়েছে এবং রঙ হয়ে গিয়েছে হলদে মতো....। শক্ত আলুগুলো সব নরম হয়ে গিয়েছে। কোনো বৈজ্ঞানিকের হাত দিয়ে এসব অদ্ভুত ব্যাপার ঘটেনি, ঘটেছে একজন সাধারণ গৃহিণীর হাতে। অথচ হাঁড়িতে, কড়ায়, সস্‌প্যানে সত্যি কি অঘটন ঘটে চলেছে তার কতটুকু চিন্তা করেন তিনি?

আলু কি?

প্রথমেই আলুর কথা ধরো। আলু কি? তোমরা বলবে এ তো সবাই জানে! না, তা নয়; সবাই নয়। কিন্তু আসলে আলু কি? আলু কি দিয়ে তৈরি; বলতে পারো কি? যদি জানতে চাও আলু কি, তা হলে একটা কাজ করতে হবে। নারকেল-কুরুনি বা ঐ রকম একটা কিছু দিয়ে একটা আলু কুরে ফেলো। এইবার এই কোরা আলু এক গ্লাস জলের সঙ্গে ভাল করে মেশাও, তারপর পাতলা কাপড়ে ছেঁকে ফেলো। জলটা গ্লাসে কিছুক্ষণ রেখে দাও, দেখবে গ্লাসের তলায় একরকম সাদা সাদা তলানী পড়বে। এইবার ওপরের জলটা ফেলে দিয়ে ঐ সাদা জিনিসটা একখণ্ড ব্লটিং কাগজের ওপর লাগিয়ে শুকিয়ে নাও। শুকোলে একরকম সাদা গুঁড়ো পাবে। এই গুঁড়োটা কি?

একে বলে স্টার্চ (Starch) বা শ্বেতসার। আলুতে যথেষ্ট শ্বেতসার থাকে। কিন্তু আমরা তা দেখতে পাই না কেন? কারণ শ্বেতসারগুলো এক একটা কোষে আবদ্ধ থাকে।

আমরা কাঁচা আলু খাই না কেন?

কারণ কাঁচা আলু খেলে ঐ স্টার্চ পাওয়া যায় না। আলু থেকে স্টার্চ বের করতে হলে তাকে কুরুনিতে ভাল করে কুরে ফেলতে হয়। আমাদের পেটের মধ্যে এরকম কুরুনি নেই, কাজেই কাঁচা আলু থেকে আমরা স্টার্চ বের করে নিতে পারি না। সেদ্ধ করলে আলুর কোষগুলির দেওয়াল ভেঙ্গে যায় আর জল গিয়ে স্টার্চে লাগে। এতে স্টার্চ নরম হয়। আয়তনে বেড়েও যায়।

সেদ্ধ করা আলু শুকনো মনে হয়, কারণ শ্বেতসার আলুর ভিতরের জল শুষে নিয়েছে। এজন্যই জল থেকে তুলতেই আলুটা শুকনো দেখায়।

পোড়া আলুর ওপর একটা শক্ত খোসা পড়ে অথচ সেদ্ধ আলুর ওপর অমন কিছু পড়ে না কেন?

তোমরা জান আলু পোড়াতে বা ভাজতে যত তাপ দরকার হয় সেদ্ধ করতে তত দরকার হয় না। তাপ বেশী হলে আলুর ওপরের স্টার্চটা গলে গঁদের মতো একটা জিনিস তৈরি হয়। একে বলে Dextrine (ডেক্সট্রাইন)।

এটা অবশ্য খুব সাধারণ জিনিস। তোমরা নানা কাজে যে গঁদ ব্যবহার কর তার অনেকগুলিই এই ডেক্সট্রাইনে তৈরি।



স্টার্চ-দেওয়া কাপড় শক্ত হয় কেন? কাপড়ের ওপর গরম ইস্ত্রী দিয়ে চাপ দিলে ঐ স্টার্চ শক্ত হয়ে ডেক্সট্রাইন (dextrine) হয়ে যায়। ভাজা আলুর ওপর যেমন একটা শক্ত পর্দা পড়ে যায় কাপড়ের ওপরও তাই হয়। তাই ইস্ত্রী করা কলার এত শক্ত হয়।

পাঁউরুটির ওপরেও ঐ রকম শক্ত খোসা আছে

ময়দাতেও আলুর মতো স্টার্চ আছে। সেই জন্যই সেঁকা রুটির উপর শক্ত খোসা জন্মে যায়। বিশ্বাস না হয় পরীক্ষা করে দেখতে পারো। একটা পাতলা ন্যাকড়ায় খানিকটা ময়দা বেঁধে সেটা এক কাপ জলে বেশ করে চটকাতে আরম্ভ করো। দেখবে কাপের জল দুধের মতো সাদা হয়ে যাবে।

এই জলটা কিছুক্ষণ রেখে দিলেই দেখবে তাতে একটা সাদা তলানি পড়বে। এটা ঠিক আলুর তলানির মতো। তাহলেই দেখছ, ময়দাতেও স্টার্চ আছে।

পাঁউরুটি কেন শক্ত হয়ে ওঠে?

এটা বুঝতে হলে আবার একটা কাজ করতে হবে। একটা কাপড়ের থলির ভেতর খানিকটা ময়দা নিয়ে সেটা জলের কলের নীচে ধরো। আস্তে আস্তে যেন স্টার্চটা ধুয়ে যায়। দেখবে ঐ কাপড়ে একটা আঠার মতো জিনিস লেগে আছে। একে বলে **gluten** বা শিরিষ আঠা। এই জিনিসটাকে চিনবার উপায় হচ্ছে এই :—এই জিনিসটাকে কয়েক ঘণ্টা যদি শুকোতে দেওয়া যায় তো এটা কাঁচের মতো শক্ত হয়ে যায়। এই জিনিসটার জন্যই পাউরুটি শক্ত হয়ে ওঠে এবং চাপ দিলে গুঁড়ো হয়ে যায়।

পাঁউরুটি ফেঁপে ওঠে কেন?

ময়দার মধ্যে 'খমির' (বা yeast) দিলে ময়দা বেশ ফেঁপে ওঠে। এর কারণ কি? তোমরা জানো, রবারের বেলুনে ফুঁ দিলে বেলুন কেমন ফুলে বড় হয়ে যায়। পাঁউরুটিতে তেমনি ক্ষেত্রেও তাই ঘটে। বেলুনে যেমন রবার পাউরুটি ও ময়দার শিরিষ আঠা। আর বাতাসের বদলে পাঁউরুটিতে যায় কার্বন ডায়ক্সাইড। খানিকটা খমির দেওয়া ময়দা নিয়ে সেটা একটা কাঁচের জারে রেখে মুখটা বন্ধ করে দাও। পরের দিন জারের মুখটা খুলে একটা দেশলাই-এর কাঠি জ্বেলে জারের

ভিতর নামিয়ে দাও। দেশলাইটা তখনই নিভে যাবে। কেন? কারণ ঐ খমির থেকে বুদ্‌বুদের মতো কার্বন ডায়ক্সাইড বেরিয়ে জার ভর্তি হয়ে ছিল। পাঁউরুটি তৈরি করবার সময় ময়দার খমির দিলেও ঠিক এই ভাবেই কার্বন ডায়ক্সাইডে বুদ্‌বুদ উঠতে থাকে, ফলে পাঁউরুটি পাহাড়ের মতো ফেঁপে ওঠে। কার্বন ডায়ক্সাইড আসে কোত্থেকে? খমির দেওয়ার ফলে ময়দা থেকে বেরোয়। এইরকম পাঁউরুটিগুলি যেন কার্বন ডায়ক্সাইডের এক একটা কারখানা।

পাঁউরুটিতে এতো ফুটো কেন?

ময়দার তাল উনুনের উপর রেখে গরম করলে খমিরটা শুকিয়ে গিয়ে শক্ত হয়ে যায় এবং সামান্য চাপেই গুঁড়ো হয়ে যায়। যে থলেগুলো কার্বন ডায়ক্সাইড গ্যাসকে বন্দী করে রেখেছিল তা ফেটে যায় এবং তাতেই কার্বন ডায়ক্সাইড গ্যাসটা বেরিয়ে আসে।

এই জন্যই রুটিতে বাতাস বেরোনর ফুটো থাকে। রুটির প্রত্যেকটা ফুটোই এই কার্বন ডায়ক্সাইড বেরিয়ে আসার ফলে হয়েছে।

পাঁউরুটি তৈরি হয় কিভাবে?

এখন পাঁউরুটি তৈরির ইতিহাসটা একেবারে গোড়া থেকে বলছি। দেখবে এ ইতিহাস তোমাদের খুব পরিচিত।

ময়দা থেকে পাঁউরুটি বানাতে গেলে কি করতে হবে? একটা পাত্রে ময়দা নিয়ে তাতে খানিকটা জল দিতে হবে।

খানিকটা খমির ও লবণ তাতে দিতে হবে ; তারপরে এগুলো ভাল করে মেশাতে হবে। খমিরের জন্য ময়দার কুচিগুলো মিশে তাল হয়ে যায়। তারপর সেই তালটিকে একটা পাত্রে আগুনের গরমে বসিয়ে রাখতে হবে।

তারপর আসল কাজ শুরু। খমিরটা ময়দার সঙ্গে মিশে কার্বন ডায়ক্সাইড গ্যাস তৈরি করে। যদি ময়দার মধ্যে আঠার মতো পদার্থটা না থাকত তাহলে কার্বন ডায়ক্সাইড গ্যাস সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে চলে যেত। এই আঠার জন্যই এটা আটকে থাকে, আর বুদ্‌বুদের মতো ফুটে ওঠে। এবং জোরে রুটির গায়ে ধাক্কা দেয় বলে ভেতরে ফুটোর মতো হয়ে যায়।

এই প্রক্রিয়ার ফলে ময়দার তালটা সজীব হয়ে ফুলে উঠতে থাকে। খুব ফুলে ওঠার পরে এটাকে চুল্লির মধ্যে দেওয়া হয়। সেখানে এটার আরও পরিবর্তন হয়। রুটির বাইরের দিকটায় খুব বেশী গরম পাওয়ায় সেখানকার শ্বেতসার পুড়ে শক্ত খোলার মতো হয়ে যায়। ভেতরের শ্বেতসারটা ফুলতে থাকে এবং নরম হয়ে যায়। আঠার মতো পদার্থটা শুকিয়ে গিয়ে ফেটে যায়। আর তাই কার্বন ডায়ক্সাইড গ্যাস বেরিয়ে পড়ে। এইভাবে শেষ পর্যন্ত একটা সুগন্ধি রুটি তৈরি হয়।

মদে বুদ্‌বুদ্ উঠেই বা কেন, ফেনাই বা হয় কেন?

মদ তৈরি হয় কেমন করে ?

বার্লি অথবা গমের দলাকে গুঁড়ো করে তাতে জল

মেশাতে হয়। তারপর তাতে খমির মেশানো হয়। খমির মেশানর ফলে এতে কার্বন ডায়ক্সাইড সৃষ্টি হয়।

মদে যে বুদ্‌বুদ্‌ বের হয় এবং তাতে যে ফেনা হয় তা আসলে হচ্ছে এই কার্বন ডায়ক্সাইড গ্যাস।



অনেকের ধারণা 'সুপ' জিনিসটা বুঝি খুব পুষ্টিকর। মোটেই তা নয়। জলের যে পুষ্টি তার চেয়ে বেশী পুষ্টি আর কিছুই নেই এতে। শুধু তফাত এই যে এতে কিছু জলের সঙ্গে আর দু-একটা পদার্থও মেশানো থাকে। এই পদার্থের পরিমাণ জলের পরিমাণের বিশ ভাগের এক ভাগ।

যদি এই সুপকে উনুনে চড়িয়ে ফোটাতে থাক তা হলে দেখবে শেষ পর্যন্ত সব জল উঠে গিয়ে পাত্রটায় প্রায় আর কিছুই নেই। যদি পরীক্ষাগারে নিয়ে গিয়ে এক প্লেট সুপকে পরীক্ষা করো তাহলে দেখবে যে এই সুপে যদি ১৯ চামচে জল থাকে তবে সিকি চামচে রয়েছে চর্বি, সিকি চামচে শিরিষ-আঠা এবং একটু লবণ। শুধু সাধারণ লবণই নয়, অন্যান্য লবণও। তাছাড়া আর যা থাকে তা সবই হচ্ছে জিভের

স্বাদের ব্যাপার—অর্থাৎ মাংস একটু। মাংসটা সেদ্ধ হয়ে গেলে এর আসল বস্তুটা জলের সঙ্গে গুলে যায়।

কিন্তু শুধু স্যুপেই যে এত জল থাকে তা নয়। আমরা যা-ই খাই না কেন, সবতাতেই অধিকাংশটাই হচ্ছে জল। শাক-সব্জিতে এত জল থাকে যে শুকিয়ে নিলে শাক-সব্জি হয়ে যাবে পালকের মতো খুব হাল্কা। এক সের মাংসে তিন পোয়াই হচ্ছে জল। আলু ও এই রকম সব্জিতেও জলের পরিমাণ এই রকমই।

আমরা মাংস খাই কেন?

এবার আসি মাংসের কথায়। মাংসতেও আছে জল, স্বাদু পদার্থ এবং লবণ। তাছাড়াও এতে আছে অ্যালবুমেন। মাংস সেদ্ধ হওয়ার সঙ্গে এটাও সেদ্ধ হয়ে ওপরে ভেসে ওঠে। মাংসের ঝোলটা খারাপ হয় বলে অনেকে এই জিনিসটা ঝাঁঝরি দিয়ে ছেঁকে তুলে ফেলে দেয়। এরকম করলে ঝোলটা হয়তো দেখতে ভালই হয়, কিন্তু মাংসের আসল জিনিসটাই চলে যায়। এই অ্যালবুমেন শরীরের পক্ষে খুব উপকারী। আমাদের শরীর রক্ষা করবার জন্য যে সব জিনিসের দরকার তার মধ্যে অ্যালবুমেন হল একটা। আমাদের মাংসের প্রায় সবটাই জল ও অ্যালবুমেন। এমন খাদ্য যদি আমরা খাই যাতে চর্বি, শর্করা, স্টার্চ আছে অনেক অথচ অ্যালবুমেন নেই, তাহলে আমাদের শরীরের ক্ষয় পূরণ হবে না এবং শেষে এর অভাবেই মরতে হবে

আমাদের খাবার জিনিস সাধারণত দুই ধরনের : এক রকম হল চর্বি জাতীয়, শর্করা জাতীয় আর স্টার্চ জাতীয় জিনিস। এগুলোর কাজ হল শরীরকে গরম রাখা, এর জন্যই আমরা কাজকর্ম করতে পারি। কিন্তু শরীর গঠন করার জন্য আমাদের সবচেয়ে বেশী দরকার অ্যালবুমেন। তোমরা জানো আগুন জ্বালাতে হলে কাঠ বা অন্য কিছু জিনিস দরকার—কাঠ ফুরিয়ে গেলে আগুন নিভে যাবে। সেটাকে জ্বালিয়ে রাখবার দরকার হলে জ্বালানির অভাবে আমাদের বাড়ির আসবাবপত্রই হয়তো পুড়িয়ে ফেলতে হয়। যখন আমাদের শরীরে চর্বি, শর্করা বা স্টার্চ জাতীয় জিনিসের অভাব ঘটে তখন বেঁচে থাকবার জন্য আমাদের শরীরের অ্যালবুমেন খরচ করতে হয়। অ্যালবুমেন একাধারে শরীর গঠন করার কাজে লাগে আবার দরকার হলে তাকে চালু করবার কাজেও লাগানো যায়। অ্যালবুমেন তাই শরীরের পক্ষে এত দরকারী।

কিসের জন্য মাংসের আঁশ পরস্পর লেগে থাকে ?

সেদ্ধ করা মাংস দেখেছ ? কাঁচা মাংসের সঙ্গে এর অনেক তফাত। কাঁচা মাংস বেশ আঁটসাঁট ভাবে থাকে অথচ সেদ্ধ মাংস অসংখ্য আঁশে (fibre) ভাগ করা দেখা যায়। যে 'আঠার' জন্য মাংসের আঁশগুলি আঁটা থাকে তা আমরা ইচ্ছা করলেই বার করতে পারি। এর জন্য আমাদের অনেকক্ষণ ধরে মাংস সেদ্ধ করতে হবে। তাহলেই মাংস একেবারে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। যে আঠাটা আমরা খুঁজছি সেটা

তখন জলের সঙ্গে মিশে গেছে। এই জলটাকে ঠাণ্ডা হতে দিলে একটা জেলির মতো জিনিস পাওয়া যাবে। এই জিনিসটা শুকোলে যা পাওয়া যাবে তা কি বলতে পারো ? এটা আর কিছু নয়—ছুতোর মিস্ত্রিরা যে শিরিষ আঠা ব্যবহার করে তাই। অর্থাৎ কাঠের আসবাবপত্র যে আঠা দিয়ে আটকানো থাকে মাংসের আঁশও ঠিক সেই আঠা দিয়ে আটকানো থাকে।

এখন আমাদের আহার শেষ হল। আমরা খেয়েছি মাংস আর ঝোল, রুটি আর আলুর দম। এখন আমাদের জানতে হবে সত্যি আমরা কী খেলাম এবং তাতে আমাদের কী উপকার হবে।

দুধ

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে ভাল খাবার হল যা সকল প্রাণীই তাদের ছোট ছোট শিশুদের খাওয়ায়, অর্থাৎ দুধ। দুধ আমাদের পেশী, চামড়া, হাড়, নখ আর দাঁত তৈরি করে। এই দুধ খেয়েই সিংহের বাচ্চা ক্রমশঃ প্রকাণ্ড বলশালী সিংহ হয়ে ওঠে যার গর্জনে পাহাড়ও কাঁপে। সমুদ্রের বিশাল তিমি মাছ এই দুধ খেয়েই বড় হয়—আবার ছোট গিনিপিগও ঐ দুধই খায়।

একটি শিশুর বড় হবার জন্য লাগে জল, স্নেহ পদার্থ (চর্বি বা মাখন জাতীয়) শর্করা, অ্যালবুমেন ও লবণ—দুধে এ সমস্তই পাওয়া যায়। স্নেহ পদার্থগুলি দুধের ওপর ছোট ছোট বিন্দুর

মতো ভেসে থাকে। এই পদার্থগুলি জলের চেয়ে হাল্কা বলে সরের মতো উপরে ভেসে থাকে। এই সরের কুচিগুলো মন্থন করে জল থেকে আলাদা করে ফেলা হয়। এই সর থেকে খুব ভাল মাখন তৈরি হয়।

দুধ টক হয়ে যায় কেন?

দুধ যদি পর পর দিন দু-এক ফেলে রাখা যায় তাহলে টকে যায়। ইচ্ছে করলে অবশ্য দুদিন কেন দু সেকেণ্ডেই দুধ টকিয়ে দই করে ফেলা যায়, যদি তাতে একটু ভিনিগার দেওয়া হয়। এই দইটা কি? এটা হল কেসিন বা দুধের অ্যালবুমেন। এ জিনিসটা দুধের সঙ্গে মিশে থাকে ঠিক যেমন জলের সঙ্গে চিনি মিশে যায়। যদি দুধে একটু অ্যাসিড বা অম্ল দেওয়া হয় তবে এই কেসিন স্নেহ পদার্থ নিয়ে আলাদা হয়ে যায়।

কিন্তু তোমরা জিজ্ঞেস করবে—দুধ যদি ফেলে রাখা হয় তবে দই হয়ে যায় কেন, এতে তো আর কেউ কোন অ্যাসিড দেয় না? দুধকে টকিয়ে দেবার কাজ করে এমন এক রকম জীবাণু বাতাসে সর্বদা থাকে। এগুলো যখন দুধে পড়ে তখন দুধের শর্করা ল্যাকটিক অ্যাসিডে পরিণত হয় আর দুধ টকে যায়। দুধ গরম করলে এই জীবাণুগুলি মরে যায়, তাই দুধ সহজে দই হয়ে যায় না। অনেক সময় দেখা যায় যে দুধ গরম করার সঙ্গে সঙ্গে "ছানা" হয়ে যায়। এর কারণ আর কিছু নয়—দুধ গরম করার আগেই

জীবাণুগুলো তাদের কাজ করে ফেলেছে অর্থাৎ অ্যাসিড তৈরি করে ফেলেছে।

পনিরের মধ্যে ফুটো ফুটো থাকে কেন?

যদি টোকো দুধ অর্থাৎ দই-হয়ে-যাওয়া দুধকে অনেকক্ষণ বদ্ধ জায়গায় রেখে দেওয়া যায় তাহলে জীবাণুর প্রক্রিয়ার ফলে সেটা দই থেকে পনিরে পরিণত হয়। পনিরে যে ফুটো ফুটো ভাব দেখা যায় তা ঠিক পাঁউরুটিরই মতো। কার্বন ডায়ক্সাইডের জন্যই এরকম হয়। এই কার্বন ডায়ক্সাইড তৈরি করে জীবাণুগুলি।

পনির অনেকদিন পর্যন্ত ঠিক থাকে তার কারণ পনিরের ওপর দিকটায় একটা পর্দা পড়ে যায়। এই পর্দার জন্যই জিনিসটা শুকিয়ে যায় না এবং ক্ষতিকর জীবাণু কিছু করতে পারে না।

সুইজারল্যাণ্ডের লোকদের মধ্যে একটা প্রথা আছে। ছেলেমেয়ে জন্মালে সেইদিন তারা পনিরের একটা বড় টুকরো তৈরি করে, তাতে সন্তানের নাম ও তারিখ লেখা থাকে। তারপর থেকে প্রত্যেক জন্মদিনে এই পনিরের টুকরোটা টেবিলে রাখা হয়। সারা জীবন এটা রক্ষা করা হয় এবং তার মৃত্যুর পর তার ছেলেমেয়েদের হাতে এটা চলে যায়।

সুইজারল্যাণ্ডের একটি সংবাদপত্রে খবর বেরিয়েছিল যে ১২০ বছরের পুরনো একটা পনিরখণ্ড দেখা গিয়েছে। এই

পনিরখণ্ডটি অতি সম্প্রতি কেটে খাওয়া হয়েছে এবং এটা নাকি খেতে খুব ভালই লেগেছে।

আদিম যুগে মানুষ কি খেত?

এমন একদিন ছিল যখন মানুষ চাষবাস করতে জানত না। তারা মাংস খেয়েই বেঁচে থাকত। তারা শুধু বুনো জন্তু বা পাখি খেত তা নয়। অনেক সময় বন্দী মানুষের মাংসও খেত। আফ্রিকা দেশের একরকম আদিম অধিবাসীর কথা শোনা যায়, যারা যুদ্ধ করবার সময় "মাংস চাই, মাংস চাই" বলে চিৎকার করত। মাংস অবশ্য আর কারও নয়, শত্রুপক্ষের লোকের। বুঝতেই পার হেরে গেলে তাদের শত্রুদের মনের অবস্থা কেমন হত?

উত্তর আমেরিকার রেড-ইণ্ডিয়ানরা শ্বেতাঙ্গদের প্রথম শস্য ক্ষেত্র দেখে কি বলেছিল সে সম্বন্ধে একটা ভাল কথা আছে। একটা দলের সর্দার তার লোকদের নাকি বলেছিল: "সাদা চামড়াওয়ালা লোকগুলো নিশ্চয়ই আমাদের চেয়ে বেশী জোরদার। কেননা আমরা সব সময় খাবার মাংস পাই না। আর মাংস তৈরি করতে হলে বেশ কয়েক বছর লাগে। কিন্তু সাদা চামড়ার লোকেরা এই ছোট ছোট শস্যগুলো মাটিতে পুঁতে দিয়ে কি মন্তরের জোরে যে কয়েক মাসের মধ্যেই হাজার হাজার শস্যের কণা তৈরি করে কে জানে! যে জন্তুগুলো থেকে আমরা মাংস পাই— তাদের চারখানা করে পা দিয়ে তারা আমাদের কাছ থেকে

পালিয়ে যায়, অথচ দৌড়ে গিয়ে তাদের ধরবার জন্যে আমাদের মোটে দুখানা পা আছে। সাদা মানুষের ফসল কিন্তু অন্যরকম—এগুলো যেখানে পোঁতা হয় সেখানেই থাকে। ...শীতকালে আমরা শীতে প্রায় জমে যাই, আর সারাদিন শিকারের পিছনে ছুটি, অথচ এই সাদা চামড়াওয়ালা লোকগুলো বেশ আরামে ঘরের মধ্যে থাকে। আমি বলে দিচ্ছি এই শস্যখেকো লোকগুলিই আমাদের মতো মাংসখেকো জাতগুলোকে শেষ করবে। আর তার বেশী দেরিও নেই।”



কবে যে প্রথম মানুষ ফসল জন্মাতে শিখল ইতিহাসে তা পাওয়া যায় না। তবে অতীত কালের মিশরের পিরামিডের মধ্যে মানুষের পাথরের যাঁতায় শস্য পেষার ছবি আছে। অবশ্য আমাদের এখনকার রুটির “পূর্ব-পুরুষ” একেবারে অন্যরকম ছিল। তখনকার রুটি ছিল জল দিয়ে মাখা গমের গুঁড়োর চাপড়া। এইগুলো শুকিয়ে রেখে

দেওয়া হত ভবিষ্যতে খাবার জন্যে। এখনও প্রাচ্যদেশে এই রকম করেই রুটি করে।

এই মাখা গমের গুড়োগুলো অনেক সময় টক হয়ে যেত। ফলে রুটি বেশ নরম হত। এই দেখতে দেখতে কোনো মানুষের মাথায় এই 'টকে' যাওয়া আটা নতুন আটার সঙ্গে মিশিয়ে মাখার মতলব আসে। এর থেকেই পাঁউরুটির আবিষ্কার।

রুটি টকে যায় কেন?

বাতাসে যে জীবাণু আছে তারাই এভাবে আটাকে টকিয়ে দেয়। বাতাসে এরকম অনেক জীবাণু থাকে। এখনও অনেকে টকে-যাওয়া আটা রেখে দেয় নতুন আটা টকাবার জন্য। ঠিক দই-এর জোড়নের মতো।

রুটি আবিষ্কারের পর অনেক বছর কেটে গেছে। তারপর মানুষ ভাল করে চাষবাস করতে শিখলে— তারপর ভাল করে পাঁউরুটিও তৈরি হল। বলতে কি মোটে তু'শ বছর আগেই বড়লোকেরা যেরকম রুটি খেত আজকাল সাধারণ লোকেরাও সেরকম রুটি খাওয়ার কথা ভাবতেও পারে না। এমন কি ধনী লোকেরাও আলু কি জিনিস জানত না।

তারপর আলু। আলু এখন অত্যন্ত সাধারণ জিনিস, সকলেই খায়। কিন্তু ইউরোপেও আলুর চলন হয়েছে সম্প্রতি। ফরাসী বিপ্লবের সময়েও (১৭৮৯ খ্রীঃ) লোকের

কাছে আলু একটা নতুন জিনিস ছিল। আজকাল আলু সেদ্ধ ইউরোপের অতি সাধারণ লোকেরই খাবার, অথচ ঐ সময় রাজাদের পাতে আলু সেদ্ধ পড়ত না।

আলুর জন্মভূমি হল দক্ষিণ আমেরিকার পেরু আর চিলি। আমেরিকা থেকে আলু ঠিক কবে যে ইউরোপে আনা হল তা আমাদের জানা আছে। ১৫৩৪ খ্রীষ্টাব্দে আলু সর্বপ্রথম ইউরোপের স্পেনে আনা হয় অনেক সোনারূপোর সঙ্গে। তারপর পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই স্পেন থেকে ইউরোপের অন্য দেশে আলুর চাষ হল। প্রথমে হয় ইংল্যাণ্ডে, পরে অস্ট্রিয়ায়, আর সবচেয়ে শেষে জার্মানী আর ফরাসী দেশে।

প্রথম প্রথম লোকে আলুকে বড় সন্দেহের চোখে দেখত বিশেষ করে বুড়ো লোকেরা। শোনা যায়, ছোট ছেলেমেয়েরা খুব তাড়াতাড়ি আলু খেতে শেখল। বাদামের চেয়ে আলুই তাদের বেশী ভাল লাগত। নতুন দেশে এসে আলুরও অনেক উন্নতি হল। কয়েক বছরের মধ্যেই আলু রাজ-রাজড়ার বিলাসের আহার থেকে সাধারণ লোকের খাবার হয়ে উঠল।

আগে মানুষের পানীয় কী ছিল?

আগেকার যুগে বড়লোকেরা মদ খেতেন, আর খেতেন মধু ও জল দিয়ে তৈরি একরকম পানীয়। গরিবদের কপালে অবশ্য জল ছাড়া আর কিছুই জুটত না। কেউই কিন্তু চা বা কফির নামও শোনেনি।

প্রায় তিনশো বছর আগে ইউরোপের লোকেরা জানতে

পারল যে চীন আর জাপানের লোকেরা একরকম আশ্চর্য পানীয় ব্যবহার করে। লোকে বলত এই জিনিস খেলে মানুষের আয়ু বাড়ে। ১৬১০ খ্রীঃ সবচেয়ে প্রথম ইউরোপে চা-এর ব্যবহার আরম্ভ হয়। রাশিয়াতে আরও একশ বছর পরে। সবচেয়ে প্রথম সুদূর যবদ্বীপ থেকে চা ইউরোপে ওলন্দাজ বণিকেরা আনে। এর ব্যবহার চালানর জন্যে নানারকম অদ্ভুত অদ্ভুত বিজ্ঞাপন বের হত। লোকে চা'কে জানত গাছের শেকড় থেকে তৈরি "দৈব ওষধি" বলে। লোককে তখন প্রতিদিন চল্লিশ পঞ্চাশ কাপ চা খেতে বলা হত। একজন ওলন্দাজ ডাক্তার আবার আর এক ধাপ এগিয়ে



গিয়েছিলেন। তিনি চা'কে সব রোগের ওষুধ বলে চালাতেন।

আসলে কিন্তু চা একরকম গাছের পাতা থেকে তৈরি হয়। আর চা কোনরকম ওষুধ নয়। বলতে কি কড়া চা শরীরের পক্ষে বড় খারাপ। যা হোক ব্যবসাদারদের অনেক

প্রচার সত্ত্বেও খালি বড়লোকেরাই চা খেতে আরম্ভ করল—কারণ চা-এর দাম তখন অনেক।

চা-এর কিছু পরে এল কফি। এ জিনিসটা আমদানি করল ফরাসী বণিকরা। অনেক দিন থেকেই তারা প্রচার করছিল যে তুর্কী এবং মিশর দেশে একরকম জিনিস আছে যাকে ও দেশের লোকে বলে 'কোফা'। এ জিনিসটা ও দেশের লোক সরাইখানায় মদের বদলে পান করে। এ খেলে নাকি মনের যত দুর্ভাবনা, দুশ্চিন্তা চলে যায়, হজম করার শক্তি বেড়ে যায় আর শরীরও ভাল হয়।

কয়েক বছরের মধ্যেই কফি ফরাসী দেশের রাজাদের পার্টিতে দেখা যেতে লাগল। রাজার দেখাদেখি শুরু করল জমিদারেরা। তারপর খেতাবধারী গণ্যমান্য ব্যক্তিরা। শেষ পর্যন্ত রাজদরবারের অনুসরণ করল খেতাবহীন বণিক, ডাক্তার ও উকিলেরা। জায়গায় জায়গায় কফিখানা খোলা হল আর লোকে সারাক্ষণ সেখানে বসে কাটাতে লাগল। ঐযুগে রাজদরবারের নতুন আদবকায়দা চট করে লোকে অনুসরণ করত।

একদল লোক অবশ্য কফির বিরুদ্ধে অনেক কিছু বলে বেড়াতে লাগল, যেমন তারা বলেছিল ক্যাথলিকদের (খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীদের এক অংশ) এ জিনিসটা খাওয়া উচিত নয়, কারণ এর জন্ম তুর্কীস্থানে। কেউ কেউ বলতেন কফি খেলে পাকস্থলী নষ্ট হয়ে যায় আর আয়ু কমে যায়। ফ্রান্সের মন্ত্রী কোলবার্ত-এর (Colbert) পাকস্থলী নাকি কফি খেয়ে একেবারে

পুড়ে গিয়েছে। একজন রাজকুমারী বলেছিলেন পৃথিবীর কোন জিনিসের বদলেই তিনি এই 'ঝুল-মেশানো জল' খেতে রাজী হবেন না। তিনি কফিকে বলতেন 'ঝুল-মেশানো জল'। এই বিদেশী পানীয়ের চেয়ে তাঁর কাছে চিরপরিচিত বিয়ার শতগুণ ভাল।

কফির চেয়ে খারাপ অভ্যর্থনা পেল চকোলেট। এ জিনিসটা যখন প্রথমে ইউরোপে এল তখন লোকে বলত এ কেবল শুয়োরদের খাবারই উপযুক্ত—কেননা এ খেলে মানুষের রক্ত পুড়ে নষ্ট হয়ে যায়, মানুষ মরে যায়। অবশ্য বিখ্যাত আবিষ্কর্তা কর্টেজ (Cortez) মেক্সিকো থেকে যে চকোলেট এনেছিলেন তা এখনকার চকোলেটের মতো নয়। মেক্সিকোর লোকেরা কোকো, ভুট্টা আর গোলমরিচ এই তিনটে জিনিস দিয়ে চকোলেট তৈরি করত—তাতে চিনি দিত না। অনেক দিন পরে লোকে আজকাল আমরা যে রকমভাবে তৈরি করি সেই ভাবে চকোলেট তৈরি করতে শিখলে অর্থাৎ কোকো গুঁড়ো করে তার সঙ্গে চিনি ও নানারকম সুগন্ধী জিনিস মিশিয়ে তাই দিয়ে চকোলেট তৈরি করতে আরম্ভ করলে।

চা, কফি আর চকোলেট এই তিনটের সম্বন্ধে যে সব প্রচার চলেছিল তার মধ্যে কোনটা সত্যি? চা আর কফিতে পুষ্টিকর জিনিস খুব কমই আছে, বরং চা বুক আর স্নায়ুর পক্ষে অপকারী। কোকো আর চকোলেট—বিশেষ করে চকোলেট কিন্তু ঠিক উল্টো। এতে স্নেহজাতীয় জিনিসও আছে আবার অ্যালবুমেনও আছে। এই জন্যেই যাঁরা মেরু দেশে যান তাঁরা

সঙ্গে করে প্রচুর চকোলেট নিয়ে যান। কোকো আর চকোলেটের মধ্যে আবার চকোলেট বেশী পুষ্টিকর। কারণ কোকো তৈরি করতে কোকো প্রথমে গুঁড়িয়ে ফেলা হয়—তারপর সেটাকে গরম করে তা থেকে স্নেহজাতীয় জিনিসটা বের করে দেওয়া হয়। এ কারণে চকোলেট অপেক্ষা কোকোতে স্নেহজাতীয় পদার্থ কম থাকে।

কি দিয়ে খাওয়া হত ?

আগেকার দিনে বড়লোকের টেবিলে থালাবাসনের অভাব ছিল না। সোনা-রূপোর প্লেটের ছড়াছড়ি দেখা যায়। কত যে জিনিসপত্র তা তোমরা কল্পনাও করতে পারবে না। কিন্তু কাঁটা-চামচে তাদের ছিল না—সাধারণ কাঁটা-চামচে যা রোজ ব্যবহার হয়।

তখন তারা খেত হাত দিয়ে। হাতের পাঁচ আঙুল দিয়ে খেতে মোটেই তারা লজ্জা পেত না। এমনকি ছুরিও তারা বেশী ব্যবহার করত না, এক টেবিলে হু-তিনটে মাত্র। বেশী দরকার হলে প্রতিবেশীর কাছ থেকে ধার করে আনত।

প্লেটও আগে বড় একটা থাকত না। রুটির বড় বড় টুকরো-গুলোই প্লেট হিসেবে ব্যবহার হত। খাওয়ার পর রুটির এই টুকরোটা ফেলে দেওয়া হত, এটা ভিখারিরা কুড়িয়ে নিত কিংবা কুকুরে খেয়ে নিত। মাত্র ৩০০ বছর হল কাঁটা-চামচের প্রচলন হয়েছে। প্রথম যখন প্রচলন হয় তখনও কাঁটা-চামচের ব্যবহার হত বড়লোকদের টেবিলেই।

পুরাকালে বড়লোকেরা খাওয়া-দাওয়া করত কিরকমভাবে তা জানতে হলে যেতে হবে মধ্যযুগীয় এক দুর্গবাড়ির ভোজ-সভায়। সেখানে গিয়ে দেখবে সিঁড়ি দিয়ে উঁচুতে উঠতে হবে ও একটা বিরাট হলঘরে প্রবেশ করবে। হলঘরটার ছাদ উঁচু, মশালের আলোয় স্বল্পআলোকিত। জানালাগুলিতে খড়খড়ি আঁটা। বাইরে আলো থাকলেও ঘরের ভেতরটা অন্ধকার। তখনও কাঁচের আবিষ্কার হয়নি, তাই শীতের দিনে ঘর গরম রাখবার জন্য খড়খড়ি বন্ধ করে রাখতে হত।

খাবার টেবিল কিন্তু সেখানে নেই। তখন স্থায়ী খাবার টেবিল থাকত না। খাওয়ার সময় হলে তখন টেবিল নিয়ে আসা হত।

ভোজের সময় এলে দেখবে, সবুজ হাতকাটা, অদ্ভুত পোশাকে ও লাল জুতো পরে চাকররা এসে তাড়াতাড়ি কাঠের পায়া ও তার উপর কাঠের তাক সাজিয়ে দিয়ে গেল।



তারপর একটা নক্‌সা-কাটা চাদর বিছিয়ে দিল। এই চাদরে রয়েছে বল্গা হরিণ, কুকুর ও মুখে শিংওয়ালা শিকারীদের নক্‌সা।

তারপর তারা টেবিলের উপর লবণের পাত্র রাখল, রুটির প্লেট সাজিয়ে দিল এবং তার ওপরে রাখল দুটি করে ছুরি। তারপর তারা বসবার বেঞ্চিগুলো টেবিলের কাছে ঠেলে এগিয়ে দিল এবং তারপর অতিথিদের খেতে ডাকল।

একদল লোক কলরব করতে করতে খেতে এল। দুর্গস্বামী এলেন, তার পরিবার পরিজন ও প্রতিবেশী জমিদাররা এল। এরা সবই সবেমাত্র শিকার থেকে ফিরেছে। এরা সকলেই দীর্ঘদেহী, গোলাপী মুখাবয়ব শ্মশ্রুমণ্ডিত।

দুর্গস্বামীর সঙ্গে এল তার দুটো সাংঘাতিক চেহারার পোষা কুকুর। ইশারা করলেই যেন কুকুর দুটো যে কোন লোককে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলতে পারে। শেষকালে এলেন দুর্গস্বামীর স্ত্রী। তিনি এতক্ষণ দেখছিলেন সব ব্যবস্থা ঠিক মতো হচ্ছে কিনা।

সকলে খেতে বসে গেল। তারা এখন নেকড়ের মতো ক্ষুধার্ত। একজন লোক মাংস-ভরা একটা বিরাট পাত্র নিয়ে এসে রাখল টেবিলের উপর। ভালুকের মাংস, গরম ধোঁয়া বেরুচ্ছে তা থেকে। লোকটি মাংস কেটে কেটে ছুরির ডগে করে সকলকে দিতে লাগল। মসলা-দেওয়া মাংস, দেখতে দেখতে আস্ত ভালুকটার চারভাগের একভাগ সকলের পেটে চলে গেল। তারপর আর একটা আস্ত শূয়োরের মাংস এল। তারপর এল সেদ্ধ করা হরিণের মাংস, তারপর রাজহাঁস, ময়ূর ও নানা রকমের মাছ।

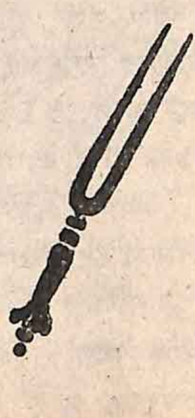
টেবিলের ওপরে হাড়ের স্তূপ জমে উঠতে লাগল।

টেবিলের তলাতেও হৈ-চৈ করে খাওয়া চলছে। কুকুর ছুটো ফেলে-দেওয়া হাড়গুলো খাচ্ছে।

পরিতৃপ্তির সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে খাওয়া চলল। এখানে খাওয়াটাই আসল। খাওয়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চাকররা জিনিস জোগাতে পারে না। মাংসের পরে এল কেক, আপেল, বাদাম। তারপর এল পানীয়। এক জালা মদই উড়ে গেল। মাতাল হয়ে তখন অতিথিরা গড়াগড়ি যেতে লাগল মেঝেতে; শেষ পর্যন্ত নাক ডাকিয়ে ঘুমুতে লাগল; কুকুরের চিৎকারকেও হার মানতে হত তাদের নাক-ডাকার কাছে।

ইংল্যাণ্ডে প্রথমে কাঁটা-চামচ এল

১৬০৮ সালে টমাস করিয়েট নামে একজন ইংরেজ ইতালিতে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি বিশেষ বিশেষ যা কিছু দেখেছেন তা সবই তাঁর ডায়েরীতে লিখে রাখতেন। ভিনিসে জলের মধ্যে দাঁড়ানো সুন্দর সুন্দর প্রাসাদ, অতীত রোমের মার্বেল পাথরের তৈরি স্ট্যাচু, ভিসুভিয়াস পাহাড়ের বিভীষিকা—সবই তাঁর ডায়েরীতে তিনি লিখে রেখেছেন। একটা জিনিসই তাঁর কাছে সবচেয়ে আশ্চর্য লেগেছে ভিনিসের রাজপ্রাসাদ ও ভিসুভিয়াসের চেয়ে। তাঁর ডায়েরীর এক জায়গায় তিনি লিখেছেন:



'ইতালীয়রা মাংস খাবার সময় লোহার বা রূপোর একরকম ফর্ক ব্যবহার করে। হাতে করে মাংস খাওয়া খুব অভদ্র বলে তারা মনে করে। কেননা সব সময়ে হাত তো পরিষ্কার থাকে না।'

ফিরে আসবার আগে এইরকম কিছু ফর্ক তিনি নিজের জন্য সংগ্রহ করেন। এগুলো অবশ্য এখনকার ফর্কের মতো নয়। এই ফর্কের মাত্র দুটো কাঁটা একটা হাতল থেকে বেরিয়ে এসেছে। অনেকটা আমাদের চিমটের মতো।

বাড়ি ফিরে এসে করিয়েট বন্ধুবান্ধবদের দেখান। একটা ভোজের ব্যবস্থা করে সেখানে তিনি ইতালীয় কায়দায় ফর্কের সাহায্যে খেতে লাগলেন।

সকলে তাঁর খাওয়া চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল। ব্যাপারটা যখন তিনি বুঝিয়ে দিলেন তখন সকলে ভাল করে ফর্কটাকে দেখতে চাইল। সকলের হাতে ফর্কটা ঘুরতে লাগল। মেয়েরা এটার কারুকার্য দেখে প্রশংসা করল, পুরুষরা ইতালীয়দের নিপুণতার তারিফ করল। কিন্তু সকলেই একমত হয়ে বলল যে ইতালীয়রা বোকা, কারণ ওটা দিয়ে খাওয়া তেমন সুবিধা নয়।

টমাস করিয়েট তাঁদের সঙ্গে তর্কবিতর্ক করে এর উপকারিতা বোঝালেন। তিনি যখন বললেন যে হাতটা সব সময় পরিষ্কার থাকে না, তখন সকলে তো চটে উঠল। তারা রেগে বলল, কেন, ইংল্যাণ্ডের লোকেরা কি খাওয়ার আগে হাত ধোয় না? আর প্রকৃতির দেওয়া হাতের দশটা আঙুলই

কী আমাদের পক্ষে যথেষ্ট নয়? মানুষের তৈরি এ দুটোর দরকার কী? এই অদ্ভুত কাঁটা দুটোতে খাওয়ার সুবিধাটা যে কি হয় তাও তো বোঝা গেল না।

করিয়েট হাতেনাতে ফর্কের ব্যবহারটা দেখাতে গেলেন। কিন্তু প্রথমে যে মাংসের টুকরোটা ফর্ক দিয়ে ধরতে গেলেন, সেটা তো টেবিলের উপর পড়ে গেল। দেখে তো সকলে হেসে কুটিকুটি। তখন নিরুপায় হয়ে করিয়েট তাঁর ফর্ক পকেটে পুরে রাখলেন।

তারপর পঞ্চাশ বছর কেটে গেল ইংল্যাণ্ডে ফর্কের প্রচলন হতে। আগুনের ব্যবহার শিখতে বা কামারের কাজ শুরু হতে কতদিন লেগেছে তার কাহিনী অনেকেই জানে। এই ফর্কের ব্যবহার শুরু হতেও অনেক কাঠখড় পুড়েছে। শোনা যায় যে লোকে যখন লেসওয়ালা কলার পরতে আরম্ভ করল তখনই ফর্ক ব্যবহার শুরু হল। এই কলার থাকায় খেতে অসুবিধা হত। থুতনিটা সোজা রেখে খেতে হত, মাথা ঝোঁকানো চলত না। এই রকম কলার পরে খেতে গেলে হাতের চেয়ে ফর্কেই বেশী সুবিধা।



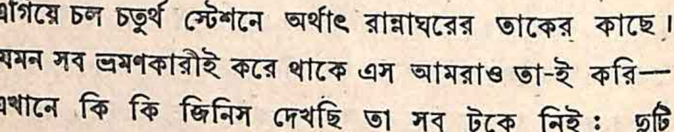
হয়তো এটা নেহাত গল্প কথা। মনে হয় যখন থেকে লোকেরা একটু বেশী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হতে শিখল, যখন থেকে পোশাক-পরিচ্ছদ বেশীবার বদলাতে শিখল, তখন থেকেই ফর্কের ব্যবহার চালু হল।

রান্নাঘরের তাক

চতুর্থ স্টেশন

সাতটি জিনিস—সাতটি ধাঁধা।

তোমরা এতক্ষণ ধরে অনেক ঘুরলে ; জলের কল থেকে উনুন, উনুন থেকে বাসন-কোসন ; ঘুরে ঘুরে তোমরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছ কী? যদি না হয়ে থাক, তবে আর একটু এগিয়ে চল চতুর্থ স্টেশনে অর্থাৎ রান্নাঘরের তাকের কাছে। যেমন সব ভ্রমণকারীই করে থাকে এস আমরাও তা-ই করি—এখানে কি কি জিনিস দেখছি তা সব টুকে নিই : দুটি



তামার সসপ্যান, একটা কেক তৈরির কৌটো, একটা চায়ের কেটলি, একটা মাটির হাঁড়ি, একটা কলাইকরা মগ আর একটা রান্নার বড় ডেক্‌চি।

এ কটাই তাকে রয়েছে। সাতটা জিনিস সাতটা ধাঁধা। ধাঁধা? সসপ্যান আর মাটির হাঁড়িও আবার ধাঁধা!

অবশ্যই। সসপ্যান দুটোই ধর। দুটোই তামার তৈরি। তবে তাদের রঙ্ আলাদা কেন? একটা লাল আর একটা হলদে কেন? ভিতরের দিকে দুটোই সাদা কেন?

তামা কি লাল, হলদে, সাদা—এই তিন রঙ-এর হয় ? একটা ছোট কেটলির ওজন কি একটা বড় কেটলির চেয়ে বেশী হতে পারে যদি দুটোই সমান পুরু হয় ?

তোমরা বলবে, 'না'। ডেক্‌চিটা যদিও তিনগুণ বড় কিন্তু ওজনে ছোটটার মাত্র অর্ধেক। অথচ দুটোই এক জিনিস দিয়ে তৈরি, এটা কি করে হল ?

এখন চায়ের কেটলি আর কেক তৈরির কৌটোটা নাও। দুটোই টিনের তৈরি। কিন্তু টিন জিনিসটা কি ? লোহা আর টিনে তফাত কি ?

সকলের শেষে নাও কলাইকরা লোহার মগটা। এটা কি ভাঙতে পারবে ? ঢালাই লোহা তো কাঁচ নয়। তবু সহজেই এটা ভাঙা যায়। হাতুড়ির এক ঘা মার, দেখবে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে।

এখন দেখছ, সব কিছুই এক একটা ধাঁধা।

বিভিন্ন ধাতুতে বিভিন্ন জিনিস তৈরি হয় কেন ?

এই সাতটি জিনিসের প্রত্যেকটিই আলাদা ধাতুতে তৈরি। একই ধাতু দিয়ে এগুলো তৈরি করা হয় না। কেন ? অবশ্য কখনো কখনো তা হয়। কেটলি ঢালাই লোহা দিয়েও তৈরি হতে পারে, আবার তামা দিয়েও হতে পারে। আর টিনেরও হতে পারে ; কিন্তু স্টোভের পোকার কখনো কি ঢালাই লোহা বা টিন দিয়ে তৈরি হয় ? তা হয় না, কারণ টিন সহজে দুমড়ে

যায়, আর ঢালাই লোহার জিনিস ভেঙে যায় শক্ত জিনিসের সঙ্গে ঘা খেলে।

প্রত্যেক ধাতুরই নিজস্ব বিশেষত্ব আছে—একটা এসিডে ক্ষয়ে যায় আর একটা হয়তো জলে ; কোনোটা সাবধানে ব্যবহার করতে হয়, আবার কোনোটা যেমন-তেমন ব্যবহারেও নষ্ট হয় না। তাই জিনিস তৈরির আগে ভাবতে হবে জিনিস-টাকে কি খুব উপদ্রব সইতে হবে, না শান্তিতে থাকতে হবে, তাতে এসিড রাখা হবে, না জল, না অন্য কিছু?

সবচেয়ে শক্ত জিনিস কি?

লোহা শক্ত এবং অনেকদিন টেকে বলেই তোমরা জান। এজন্যই বড় বড় পুল এবং রেল-স্টেশন প্রায় সর্বদাই লোহা দিয়ে তৈরি হয়। কিন্তু লোহার একটা দোষ আছে, লোহা বেশী দিন টেকে না।

যেমন ধর লোহার তৈরি পুলের উপর দিয়ে হাজার হাজার ভারী গাড়ি চলে যাচ্ছে—তাতে এর কিছু ক্ষতি হয় না, কিন্তু জল, বৃষ্টি, কুয়াশা এর অনেক ক্ষতি করে। জং লাগার জন্য লোহায় মরচে পড়ে, ফলে ক্রমশ কমজোরী হয়ে যায়। জং থেকে বাঁচানর জন্য রং করা দরকার হয়। লোহার পুল বা অন্যান্য অনেক জিনিস রং করা হয় বটে, কিন্তু ছুরি, কাস্তে, কোদাল প্রভৃতি অনেক সাধারণ জিনিস রং করা যায় না। এই জন্যই লোহার তৈরি পুরাকালের জিনিস আমরা সাধারণত দেখতে পাই না। তাই মিশরের ফারাও-এর হাতের আংটি বা তাঁর

রানীর গলার সোনার নেকলেস এখনও দেখতে পাওয়া গেলেও সেই সময়ের লোকদের হাতে লোহার কাস্তের একটা নমুনাও আমরা পাইনি। হয়তো কয়েক হাজার বছর পর ভবিষ্যতের বৈজ্ঞানিকরা আমাদের সময়ে ব্যবহার করা লোহার কোন চিহ্নই দেখতে পাবে না। এ যুগের সমস্ত লোহাই হয়তো মরচে পড়ে নষ্ট হয়ে যাবে। মরচে পড়া মানে কি তোমরা বলতে পার কি?

তোমরা দেখেছ কোন ছুরি বা লোহার কোন জিনিস ভাল করে শুকলো তাতে হলদে মতো একরকম দাগ পড়ে, একেই মরচে বলে। এই মরচে পড়ার মূল হল জল। জল যে লোহার কি ক্ষতি করে তা হয়তো তোমরা ধারণাই করতে পার না। একবার একটা জাহাজ জলে ডুবে যায়। তার প্রায় দেড় বছর পরে একদল ডুবুরী নামিয়ে দেওয়া হল যদি কোন জিনিস উদ্ধার করা যায়। এই ডুবুরীরা নীচে গিয়ে দেখে যে কয়েকটা লোহার কামানের গোলা মরচে ধরে এমন হয়ে গেছে যে তাদের ছুরি দিয়ে অনায়াসে কাটা যায়। এর থেকেই বুঝবে জল লোহার কি ক্ষতি করতে পারে।

জলের হাত থেকে লোহাকে বাঁচাবার উপায় কি?

প্রথম উপায় হল সমস্ত জিনিস পরিষ্কার করে মুছে ফেলা। অবশ্য সমস্ত জিনিস এইরকম করে মুছে ফেলা যায় না। যেমন জলের পাত্র, চা-এর জল গরম করার কেটলি ইত্যাদি আমরা না চাইলেও ভিজে থাকবে। টিনের ছাদ—এটাকে কিছুতেই মুছে শুকনো রাখা যায় না।

এজন্যই লোহার জিনিসে মরচে পড়বেই। গরম কালেও লোহায় মরচে পড়ে, কেননা বাতাসে সর্বদা কিছু পরিমাণে জল থাকে। সম্পূর্ণ শুকনো বাতাস বলে কিছু নেই, অনবরত বাতাস চারপাশের সবকিছু থেকে জল শুষে নিচ্ছে—ধোয়া মেঝে থেকে, শুকোতে দেওয়া কাপড় থেকে,



খানা ডোবা ইত্যাদি থেকে। সুতরাং জলের হাত থেকে কোনো জিনিসকে বাঁচাতে গেলে তার ওপর এমন একটা জিনিসের প্রলেপ দিতে হয় যার জন্য তাতে জলের ছোঁয়াচ লাগে না। তেল এইরকম একটা জিনিস—যেমন সূর্যমুখী ফুলের তেল। এই তেল মাখিয়ে দিলে লোহায় মরচে পড়ে না।

অবশ্য আসলে তা করা হয় না। তেলের বদলে আমরা নানা রকম রঙ ব্যবহার করি। এই রঙের সঙ্গে তেল গরম করে মেশানো হয়, ফলে রঙ দেবার সঙ্গে সঙ্গে

রঙ শুকিয়ে লোহার ওপর একটা শক্ত আবরণের মতো হয়ে যায়। এই আবরণটা সাধারণ তেলের চেয়ে অনেক শক্ত আর তাই অনেকদিন বেশী টেকে।

এই উপায়টা কিন্তু লোহার ছাদ, নদীর পুল ইত্যাদির জন্যেই খাটে। কিন্তু ধর চায়ের কেটলিতে তো আর এরকম রঙ দেওয়া যায় না। এতে মরচে পড়া কি করে বন্ধ করা যায়? রঙ দিলে গরম জলে হুদিনে রঙ ধুয়ে যাবে কাজেই রঙ চলবে না।

টিনে মরচে ধরে না কেন?

লোহা আর চকোলেট এ হুটোর মধ্যে একটা জিনিসের মিল আছে। চকোলেট সাধারণত পাতলা টিন দিয়ে মোড়া থাকে। চকোলেটে যে পাতলা চকচকে রাঙতার মতো থাকে সেটাই হল টিন। এর উদ্দেশ্য হল চকোলেটকে জলীয় বাষ্পের হাত থেকে বাঁচানো। অনেকে লোহাকে এই উপায়ে জলীয় বাষ্পের হাত থেকে বাঁচায়। লোহার জিনিসের ওপর একটা টিনের প্রলেপ দিয়ে দেয় যাতে মরচে না ধরে। সস্তা চায়ের কেটলি, ফলের বাক্স এবং কেকের টিনও অনেক সময় এইরকম টিন দিয়ে তৈরি হয়।

জলীয় বাষ্প থেকে লোহাকে রক্ষা করা ছাড়াও টিনের আর একটা গুণ আছে,—টিন অ্যাসিড বা টক জিনিসের হাত থেকে লোহাকে বাঁচায়। অ্যাসিড জলীয় বাষ্পের চেয়েও লোহার বেশী ক্ষতি করে। ছুরি দিয়ে লেবু কাট,

দেখবে কত তাড়াতাড়ি দাগ ধরবে, কারণ অ্যাসিড লোহাকে খেয়ে নিয়েছে। কিন্তু খুব উগ্র না হলে কোন অ্যাসিডই টিনের কিছু করতে পারে না। তবে টিনে যদি কোন দাগ থাকে সেখানটাতে মরচে ধরবে।

ছোট টিনের পাত্র ইত্যাদির ওপর টিনের প্রলেপ লাগানো যায় বটে কিন্তু তাতে অনেক খরচ পড়ে যায়। তাই অনেক সময় টিনের ছাদে সস্তা একরকমের ধাতুর প্রলেপ লাগানো হয়—সেই ধাতুটা হল দস্তা। এই দস্তা মাখানো লোহার চাদরকে গ্যালভ্যানাইজড চাদর বলে। এই জিনিসটা অবার টিনের চাইতেও ভালভাবে লোহাকে জলের হাত থেকে বাঁচায়।

তোমরা হয়তো প্রশ্ন করবে—আচ্ছা, দস্তা যদি টিনের চেয়ে ভাল হয় তবে আমাদের রান্না করার পাত্রে কেন আমরা দস্তার প্রলেপ দিয়ে নিই না? এরও কারণ আছে। দস্তা যদিও জলের হাত থেকে লোহাকে বাঁচাতে পারে, অ্যাসিডের হাত থেকে এর নিস্তার নেই। তাছাড়া দস্তার সঙ্গে টক জিনিস লাগালে যা হয় তা বিষ, এই জন্য দস্তার পাত্রে খাবার জিনিস রাখলে বিপদ হতে পারে। অবশ্য জলের পাত্র তৈরি করতে গেলে টিনের চেয়ে গ্যালভানাইজড লোহার চাদর অনেক ভাল; বালতি, মগ ইত্যাদি গ্যাল-ভানাইজড লোহায় তৈরি হয়, তা তোমরা দেখেছ।

লোহার মরণ ডেকে আনে মরচে। এই রোগ যাতে না ধরতে পারে সেজন্য সতর্ক থাকতে হবে। রঙ লাগিয়েও

নিশ্চিন্ত হবার যো নেই। নির্দিষ্ট সময় বাদে আবার রঙ লাগাতে হবে, বেশী মরচে ধরলে সে অংশটা কেটে বাদ দিতে হবে।

লোহার জিনিস কি দিয়ে তৈরি ?

বোকার মতো প্রশ্ন নয় কী ? কারণ লোহার জিনিস লোহা দিয়ে তৈরি ? লোহার জিনিস বলে যেমন কাঁটা চামচে, পেরেক, ঘোড়ার নাল ইত্যাদি যে জিনিসগুলো আমরা জানি তা সবটাই লোহা দিয়ে তৈরি নয়। খাঁটি লোহার জিনিস খুব কমই আছে। তার কারণ খাঁটি লোহা বেশী দামী আর বড় নরম, তা দিয়ে তৈরি জিনিস নাড়াচাড়া করলেই বেঁকে যাবে। খাঁটি লোহায় তৈরি পেরেক দেওয়ালে পুঁততে গেলে বেঁকে যাবে।



খাঁটি লোহার ছুরি দিয়ে বড় জোর কাগজ কাটা যাবে।

খাঁটি লোহা এমন নরম ও নমনীয় যে তা দিয়ে "লোহার কাগজ" তৈরি করা যায়। এই কাগজ সিগারেটের কাগজের চেয়েও পাতলা।

আমরা যে লোহা সাধারণত ব্যবহার করি তাতে লোহা ছাড়াও অন্য জিনিস মেশানো থাকে। অবশ্য এটা বলাই বাহুল্য যে লোহার সঙ্গে যে কোনো জিনিস

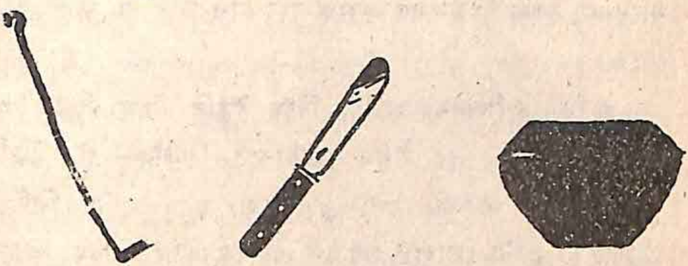
মেশালেই চলে না। যেমন ধর গন্ধক, গন্ধক মেশালে লোহার লাভের চেয়ে ক্ষতিই বেশী হয় কারণ লোহার সঙ্গে মেশাবার পক্ষে সবচেয়ে উপযোগী হচ্ছে কার্বন বা অঙ্গার। আর মজার ব্যাপার এই যে বেশীর ভাগ জায়গায় লোহা আর কার্বন পাশাপাশিই পাওয়া যায়।

লোহার সঙ্গে কার্বন কি করে মেশানো হয়? প্রথমে খনি থেকে লোহা বের করা হয়। এইটা গলাবার জন্যে খুব তাপের উনুন দরকার হয়। এই উনুনগুলো অনেকটা বড় গম্বুজের মতো আর এর ওপরে লোহা আর কয়লা পর পর সাজিয়ে দেওয়া হয়। তারপর নীচে বাতাস করা হয় —ঠিক উনুনের মতোই, তবে অনেক বেশী জোরে; বড় বড় পাম্পের সাহায্যে।

কয়লা তাপে সাদা হয়ে ওঠে—তারপর পুড়ে যায়। এদিকে লোহাও গলে আস্তে আস্তে চুঁইয়ে নীচের দিকে পড়তে থাকে। এই গরম, সাদা লোহা কার্বনকে গলিয়ে ফেলে ঠিক যেমন গরম জল চিনিকে গলিয়ে ফেলে। এই উনুন বা 'ফারনেস' থেকে যে লোহা আমরা পাই সেটা খাঁটি লোহা নয়,—লোহা আর কার্বনের মিশ্রণ। এটাকে 'পিগ আয়রণ' বা ঢালাই লোহা বলা হয়। বুঝতেই পার এই লোহায় অনেকটা কার্বন থাকে। এই গরম লোহার ওপর যদি কিছুটা বাতাস দেওয়া যায় তাহলে পুড়ে নষ্ট হয়ে যায়। এমনি করেই এই 'পিগ আয়রণ' থেকে ইস্পাত আর 'রট আয়রণ' তৈরি করা হয়।

নানান রকম লোহার মধ্যে তফাত কি ?

এ পর্যন্ত আমরা অনেক রকম লোহার কথা বললাম। প্রথমত খনি থেকে তোলা লোহা, পেটা-লোহা, পিণ্ডি লোহা আর ইস্পাত। এই নানা রকম লোহার তফাতের মূলে আছে—আর কিছুই নয়—কার্বনের মাত্রা। যেমন একটা লোহার শিক, ইস্পাতের ছুরি, একটা ঢালাই লোহার কড়া, এই তিনটে



জিনিস দেখলে মনে হয় যেন এগুলো আলাদা আলাদা জিনিসে তৈরি। যেমন ধর উনুন খোঁচাবার শিক—এটা পেটা-লোহায় তৈরি। এটা দেখতে বিশ্রী, ওপরটাও পরিষ্কার করা নয়। এটাকে বাঁকানো যায় কিন্তু সোজা করে ফেলা যায় না। এটা দিয়ে যত ইচ্ছা ঠোকাঠুকি করা যায়—ভাঙবে না। বেশী খাটুনিতে এটা ঘাবড়ায় না, উনুনের কয়লা খোঁচানো তো ওর কাছে জল-ভাত। কিন্তু ইস্পাতের একটা ছুরির দিকে তাকাও—এটা চকচকে সুন্দর, ধারাল। এর সঙ্গে শিকের কোন মিলই নেই। এটার ফলাটাকে যদি একটু বাঁকানো যায় তাহলে ছেড়ে দিলে এটা আবার সেই পুরানো অবস্থায় ফিরে আসে। অবশ্য বেশী বাঁকালে ছুরি ভেঙে যাবে। ছুরি দিয়ে উনুন

খোঁচাতে গেলে ছুরিটা ভেঙে যাবে, কিন্তু যদি কোন কিছু কাটতে চাও বা চাঁচতে চাও তবে ওর জোড়া মিলবে না। তারপর ঢালাই করা লোহার কেটলি, এটা দেখতে কালো—মানে এতে অনেকটা কার্বন আছে। হাত থেকে পড়লে এটা ভেঙে যায়—জোরে হাতুড়ি দিয়ে মারলেও এটা টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। এটা দিয়ে কিছু কাটা যাবে না, উনুন খোঁচানো যাবে না, কিন্তু কিছু সেদ্ধ করতে যদি চাও তবে ও ঠিক করে দেবে।

এ তিনটে জিনিসই লোহা দিয়ে তৈরি কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে। যেমন ধর উনুন খোঁচাবার শিকটা—এটা তৈরি করা হয়েছে একখণ্ড পেটা-লোহাকে গরম করে পিটিয়ে পিটিয়ে। পেটা-লোহার গুণ হল এই যে এটাকে গরম করলে নরম হয়ে যায়। তখন তাকে পিটিয়ে পিটিয়ে যে কোন জিনিস তৈরি করা যায়।

ছুরির ফলাও এইভাবে পিটিয়ে পিটিয়ে তৈরি করা হয়। কিন্তু তফাত এই যে পিটিয়ে ছুরির ফলাটা তৈরি হয়ে গেলে সেটাকে আবার গরম করা হয়। এবং পুরো লাল হলে সেটাকে তখনই ঠাণ্ডা জলে ডুবিয়ে দেওয়া হয়। এই রকম করলে ইস্পাত খুব শক্ত হয়।

ঢালাই করা লোহা কিন্তু পেটানো যায় না। আবার খুব গরম করলে এটা গলে যায়—একবারে তরল হয়ে যায়। পেটা-লোহা আর ইস্পাতের ব্যবহার কিন্তু অন্যরকম। এগুলো প্রথমে নরম হয় আর তারপর আরও গরম করলে গলে যায়।

আর যখন এরা এই নরম অবস্থায় থাকে তখন তাদেরই পিটিয়ে, ছাঁচে ঢেলে নানারকমের জিনিস তৈরি করা যায়। ঢালাই করা লোহার কেটলি তৈরি করা হয়েছিল—গলানো লোহা ছাঁচের মধ্যে ঢেলে পরে ঠাণ্ডা করে। এই ছাঁচ সাধারণত মাটির তৈরি হয়।

এই তিন রকম লোহার জিনিসের যে পার্থক্য তার মূলে আছে কার্বন। কার্বন সবচেয়ে বেশী থাকে ঢালাই লোহায়, তার কিছু কম থাকে ইস্পাতে, আর সবচেয়ে কম থাকে পেটা-লোহায়। একটা ছুরির ফলায় কি রকম কার্বন আছে তা তুমি সহজেই বলে দিতে পার। পাথরের একরকম ঘুরন্ত চাকার উপর ছুরি কাঁচির ফলা ধরে তাতে ধার দেওয়া হয় দেখেছ নিশ্চয়ই। এই রকম একটা চাকার উপর ছুরির ফলাটা ধরে দেখ কিরকম আগুনের ফুল্‌কি বের হচ্ছে। ফুলকিগুলো যদি ঠিক গাছের ডালের মতো বের হতে থাকে তাহলে বুঝতে হবে ফলার লোহায় অনেকটা কার্বন আছে। যত বেশী কার্বন থাকবে তত বেশী ফুলকি বের হবে। যদি ফুলকিগুলো সোজা সোজা লাইনের মতো বের হতে থাকে—কোন ডালপালা না থাকে তো বুঝতে হবে ফলাটা পেটা-লোহা দিয়ে তৈরি, ইস্পাত দিয়ে নয়।

কোন জিনিস কি দিয়ে তৈরি তা জানার জন্য এই রকম সাধারণ কিছু পরীক্ষা করলেই চলে।

আগেই বলেছি টিন লোহাকে মরচে পড়ার হাত থেকে বাঁচায়। কিন্তু কখনো কখনো টিনেরই এক রকম 'রোগ' ধরে।

অবশ্য এ রোগ খুব বেশী হয় না, তবে যখন হয় তখন 'মহামারীর' মতোই হয়। এই রকম একটা মহামারী হয়েছিল লেনিনগ্রাডে প্রায় সত্তর বছর আগে। একটা আলমারিতে সৈনিকদের অনেকগুলি বোতাম রাখা ছিল। হঠাৎ একদিন দেখা গেল যে একটা বোতামে কেমন একটা ছোট রকমের দাগ হয়েছে। দেখতে দেখতে আলমারির সমস্ত বোতামে ঐ রকমের দাগ হয়ে গেল। লোকের মনে ভীতির সঞ্চার হল, কেউ বোতামগুলোকে বাঁচাতে পারল না। কি হয়েছে বুঝবার আগেই দেখা গেল বোতামগুলো মাটির জিনিসের মতো গুঁড়িয়ে যাচ্ছে এবং পড়ে থাকছে শুধু খানিকটা ছাই-এর মতো।

বৈজ্ঞানিকরা মাথা ঘামাতে আরম্ভ করলেন: টিনের বোতামগুলোকে কি রোগে ধরল? শেষে অনেক গবেষণার পর রোগ ধরা পড়ল। বলতে পার বোতামগুলোর কি হয়েছিল? ওদের 'সর্দি' লেগেছিল। সেই বৎসর দেশে খুব শীত পড়েছিল। থার্মোমিটারে পারা শূন্যেরও চার ডিগ্রি নীচে নেমে গিয়েছিল। যে আলমারিতে বোতামগুলি ছিল, সেটাকে গরম রাখার কোন ব্যবস্থা হয়নি কারণ লোকে জানত না যে 'টিনের' আবার ঠাণ্ডা লাগতে পারে।

আরও জানা গেল টিন দু'রকমের হয়। এক রকম হল পাউডারের মতো। আর এক রকম হল যা আমরা সাধারণত দেখি। খুব বেশী ঠাণ্ডা পড়লে যখন থার্মোমিটারের পারা শূন্যেরও চার ডিগ্রি নীচে নেমে যায় তখন টিন টুকরো টুকরো

হয়ে যায়। এর ওপর গরম জল ঢাললে অবশ্য এর আগের অবস্থা ফিরে আসে। এটা কিন্তু মনে রাখা দরকার যে শুধু ঠাণ্ডা লাগলেই টিন এভাবে নষ্ট হয়ে যায় না। যদি কোন টিনের জিনিসের এভাবে ঠাণ্ডা লাগে আর তার ওপর সামান্য একটু টিন পাউডার পড়ে তবে আর রক্ষা নেই।

অন্য কয়েকটা ধাতুকেও এই রোগে ধরে তবে টিনের মতো এত তাড়াতাড়ি নয়।

হলদে রঙের তামা আছে কি?

এতক্ষণ পর্যন্ত নানারকমের লোহা আর ইস্পাতের কথাই বলেছি, কিন্তু তামার সসৃপ্যানের কথা একেবারেই ভুলে গিয়েছি।

তামার হাঁড়ি দেখতে লাল, আমরা কিন্তু বলি না যে এটা লাল তামা দিয়ে তৈরি, আমরা শুধু বলি যে এটা তামা দিয়ে তৈরি, তামা লাল রঙেরই হয়। অনেক সময় লোকে "হলদে তামার" কথা বলে, যে ধাতুটাকে লোকে হলদে তামা বলে, আসলে সেটা তামাই নয়। সেটা পিতল অর্থাৎ তামা আর দস্তা দিয়ে তৈরি একটি মিশ্র ধাতু। পিতলের অনেক জিনিসই তোমরা দেখেছ, যেমন ধর দরজার গোল হাতলগুলো। এগুলো পিতলেরই তৈরি, সাধারণত পিতলে অর্ধেকটা থাকে তামা, কখনো কখনো তিন ভাগের দুই ভাগও থাকে; পিতলে যত বেশী দস্তা থাকে তার রং তত বেশী হালকা হয়। যদি আবার অর্ধেকের বেশী দস্তা থাকত পিতলের রং একেবারে সাদা হয়ে

যেত। কাজেই রং দেখে তোমরা বলতে পারবে যে পিতলে কতটা দস্তা আছে।

যে তামার বাসনের কথা একটু আগে বললাম এগুলি একটু খুঁতখুঁতে স্বভাবের জিনিস। এগুলিকে যদি নিয়ম করে পরিষ্কার না করা হয়, তাহলেই এটাতে একটা বাদামী বা সবুজ রঙের জং ধরে। এটাকেও আমরা তামায় মরচে পড়া বলতে পারি। কারণ এর সঙ্গে লোহার মরচে পড়ার তফাত খুব কম। তবে তফাত যে নেই তা নয়, কারণ মরচে লোহাকে নষ্ট করে দেয় অথচ তামায় যে জং ধরে তাতে তামার জিনিসটার উপরটা খালি নষ্ট হয়। আর মজার জিনিস এই যে সবুজ রঙের জংটাই রঙের একটা প্রলেপের মতো কাজ করে ক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা করে, এইজন্যই এত ব্রোঞ্জের মূর্তি আজও নষ্ট হয়নি, কেবল এর ওপর একটা সবুজ রঙের প্রলেপ পড়ে শত শত বৎসর জং-এর হাত থেকে রক্ষা করছে।

তামার পয়সা একটুতেই সবুজ হয়ে যায়, উপরটায় মরচে ধরে। এগুলোকে পরিষ্কার করবার একটা সোজা উপায় আছে। একটু অ্যামোনিয়া জলে পয়সাগুলো ডুবোলেই আবার চক্‌চকে হয়ে যায়, আর তামার রং অ্যামোনিয়ার সঙ্গে মিশে চমৎকার এক নীল রং হয়।

পিতলেও মরচে ধরে তবে লোহা আর তামার চেয়ে অনেক দেরিতে।

১। ব্রোঞ্জ হল তামা আর টিন এই দুটো মিলিয়ে তৈরি একটা মিশ্র ধাতু।

এইবার সস্‌প্যানের ভিতরের দিকটা দেখ। দেখবে যে বাইরে আর ভিতরে অনেক তফাত। বাইরেটা লাল কিন্তু ভিতরটা সাদা। আগেই বলেছি তামার রং লাল। তাহলে ভিতরে সাদা জিনিসটা কি? এটা কিছুই নয়, আমাদের পুরানো বন্ধু টিন বা রাং। তামাকে টক আর নুন থেকে বাঁচাবার জন্য এই প্রলেপ লাগানো হয়। তাছাড়া টক জিনিস বা নুন আর এই দুটো জিনিস মিশে একরকম বিষ তৈরি হয়। সুতরাং টিনের প্রলেপ লাগানো হয়। আর টিনের প্রলেপটা যে শুধু তামাকেই বাঁচায় তা নয়, এটা আমাদেরও বাঁচায়।

মাটি দিয়ে কি কি তৈরি হতে পারে?

বাজারে কত রঙচঙে বাটি, জার, ফুলদানি বিক্রি হয়। তোমরা শুনে নিশ্চয় আশ্চর্য হবে যে এ সমস্তই মাটির তৈরি—যে মাটির উপর দিয়ে আমরা রোজ হেঁটে যাই। আর শুধু যে নানারকম পাত্র মাটি দিয়ে তৈরি হয় তা নয় বরঞ্চ মাটি দিয়ে তৈরি হয় না এমন জিনিসই বা কি? ইট, চীনা মাটির পুতুল, প্লেট, ধোবারা যে নীল ব্যবহার করে, সিমেণ্ট, রং এসবই মাটি দিয়ে তৈরি। সবচেয়ে আশ্চর্য এই যে, সব মাটিতেই অ্যালুমিনিয়ম আছে। অ্যালুমিনিয়ম যে কি তা তোমরা নিশ্চয় জান অথচ এই অ্যালুমিনিয়ম আবিষ্কার হয়েছে মাত্র কয়েক বছর আগে। সকলেরই অ্যালুমিনিয়ম ভাল লাগবার কারণ আছে।

অ্যালুমিনিয়ম হালকা, এতে মরচে ধরে না, খাবারের

এ্যাসিডে কোন ক্ষতি হয় না, অবশ্য সাবান আর সোডায় এর ক্ষতি হয়, কিন্তু সেটা সামান্য।

অনেকে অ্যালুমিনিয়মকে রূপালি মাটি বলে। অবশ্য রূপা আর অ্যালুমিনিয়মে তফাত অনেক। অ্যালুমিনিয়মের সাদা রঙটা শিগ্‌গিরই হলদে মতো হয়ে যায়। কারণ বাতাস লাগলে এতেও একরকম মরচে পড়ে যার জন্য এর রঙ খারাপ হয়ে যায় কিন্তু তামার মতোই তাকে নষ্ট হতে দেয় না। তাছাড়া এই হলদে প্রলেপটা একেবারে নির্দোষ। তামার জং-এর মতো এটা খাবার নষ্ট করে দেয় না।

সুতরাং যে জিনিস দেখতে ভাল থাকবে বা চকচক করবে সে জিনিস অ্যালুমিনিয়ম দিয়ে তৈরি হতে পারে না। তবে সোনা রূপা বা ইস্পাতের চেয়ে অ্যালুমিনিয়মের একটা ভাল গুণ আছে, সেটা হল এ জিনিসটা খুব হাল্কা, লোহার তিন ভাগের এক ভাগ ওজন। এই জন্যই অ্যালুমিনিয়ম এরোপ্লেন তৈরির কাজে লাগে, কারণ এরোপ্লেন এমন এক জিনিস দিয়ে তৈরি হওয়া দরকার যা বেশ হাল্কা।

অ্যালুমিনিয়ম আবার নানা রকমের জিনিসের সঙ্গে মিশিয়ে নানা রকমের ধাতু তৈরি করা যায়। তার মধ্যে একটা হলো ড্যুরালুমিনিয়ম—এটা অ্যালুমিনিয়ম, ম্যাগনেসিয়াম, তামা আর ম্যাঙ্গানিজ এই চার রকম ধাতু দিয়ে তৈরি হয়; এ জিনিসটা ইস্পাতের তিনভাগের এক ভাগ ভারী অথচ তার সমানই জোরালো।

এখন ভাবতে পার যে এই চমৎকার জিনিসটা সাধারণত

মাটিতে যথেষ্ট পরিমাণ পাওয়া যায়? কিন্তু এ পর্যন্ত বেশী খরচের জন্য মাটি থেকে অ্যালুমিনিয়ম বার করা হয়নি। অ্যালুমিনিয়ম নেওয়া যায় বক্সাইট আর ক্রিয়োলাইট বলে দুরকম খনিজ পাথর থেকে।

চীনা মাটিও এই মাটি থেকে তৈরি হয়; অবশ্য যে-সে মাটি নয়, এক রকমের বিশেষ ধরনের সাদা মাটি, তাকে বলে কেরোলীন। এই জিনিসটা অবশ্য সহজে পাওয়া যায় না।

রাশিয়ায় এ জিনিসটা পাওয়া যায় না। লেনিনগ্রাড জেলায় সাধারণ মাটি পাওয়া যায়, এর মধ্যে অন্য অনেক রকম জিনিস থাকে যেগুলোকে আলাদা করে নেওয়া যায়।



একটা কাজ কর; একটা গ্লাসে খানিকটা জল নিয়ে তাতে খানিকটা মাটি মিশিয়ে দাও, দেখবে মাটিতে যে ভারী জিনিসগুলো ছিল সেগুলো আস্তে আস্তে নীচে পড়ে যাবে আর মাটিটা জলের সঙ্গে মিশে জলটাকে ঘোলাটে করে তুলবে। এখন এই ঘোলাটে জল আর একটা গ্লাসে ঢেলে ফেল, তারপর গ্লাসটা ওই ভাবে থাকতে দাও, দেখবে

গ্লাসের নীচে আস্তে আস্তে তলানি পড়েছে আর জলটা ক্রমশ পরিষ্কার হচ্ছে। অনেকক্ষণ এভাবে রাখলে দেখবে গ্লাসে জল পরিষ্কার রয়েছে আর তার তলায় পলিমাটি। অন্য গ্লাসটিতে থাকবে নুড়ি চুন প্রভৃতি।

এই গ্লাস দুটোতে যা হল, সারা প্রকৃতি-জগতে সারাক্ষণ ধরে এই জিনিসই হচ্ছে। এই এক টুকরো মাটির ঢেলার বদলে মনে কর একটি প্রকাণ্ড পাহাড় রয়েছে আর জলের গ্লাসের বদলে ধর একটা নদী এই পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে যাচ্ছে। পাহাড়ে যত শক্ত পাথর থাকুক না কেন এই জলে তার কিছু না কিছু ক্ষয় হবেই। বছরের পর বছর এইভাবে কেটে যায় আর পাহাড়ের পাথর গুঁড়িয়ে বালি আর মাটি হয়ে যায়। নদী সেই বালি বয়ে নীচে চলে যায়। যাবার সময় পাথরের নুড়ি বা বালির বড় বড় টুকরো প্রথমে নদীর জলে থিতিয়ে যায়। তারপর যেখানে নদীর স্রোত তত বেশী নয় সেখানে মাটি আর মিহি বালির টুকরো থিতিয়ে যায়।

কাজেই নদীর তলায় একটা মাটির স্তর পড়ে। এমনও হয়তো হতে পারে যে নদীর মুখ বেঁকে গেল কিংবা নদী শুকিয়ে গেল। ফলে জল অন্যদিকে চলে যায়। কিন্তু মাটির চড়া থেকে গেল। তখন একমাত্র পাথরের নুড়ি ছাড়া আর কিছু থাকে না, যার দ্বারা আমরা বুঝতে পারি যে এখানে একটা নদী ছিল।

মাটিতে কিন্তু পাথর ছাড়া অন্য জিনিসও মিশানো থাকে। যেমন ধর লোহার মরচে। এর জন্য মাটির রং লাল বা হলদে

হয়, এইজন্যই ইটগুলো লাল হয় এতে রং না লাগালেও। বলতে কি এই মাটি থেকেই নানা রকম রং তৈরি হয়। যেমন ধর গিরিমাটি, এ হল এক রকম লাল বা হলদে মাটি যার সঙ্গে খুব বেশী লোহার মরচে মেশানো আছে।

তোমাদের এটা আশ্চর্য লাগছে না যে প্রকাণ্ড পাহাড় শেষে বালি আর মাটি হয়ে যাচ্ছে? আবার সেই মাটিতেই রান্নার হাঁড়ি হচ্ছে। একখণ্ড মাটি আর রান্নার হাঁড়িটা নাও। দেখবে দুটোতে কত তফাত। মাটি কত নরম আর সহজেই ভেঙে যাচ্ছে কিন্তু হাঁড়িটা বেশ শক্ত। মাটি জলে গুলে ফেলা যায়—জলের সঙ্গে গুলে কাদা করা যায়, তারপর সেই কাদা দিয়ে নানা রকম জিনিস গড়া যায়। কিন্তু হাঁড়িটা দিয়ে কি করা যায়? ভেঙে গুড়ো না করলে এর আকার মোটেই পালটানো যায় না।

রান্না করার হাঁড়ি থেকে আমরা কি শিখতে পারি?

মাটির জিনিস সম্বন্ধে ভাল করে জানবার সহজ উপায় হল নিজের হাতে একটা মাটির হাঁড়ি তৈরি করা, এটা খুব শক্ত কাজ নয়। লোকে কথায় বলে: "মাটির হাঁড়ি গড়তে বিশ্বকর্মার দরকার হয় না।"

প্রথমেই আমাদের মাটিটা তৈরি করে নিতে হবে শুকনো মাটির সঙ্গে জল মিশিয়ে। আমরা কোন জিনিসই ধরে নেবো না, আমরা জানতে চাইব যে "জল ছাড়া কি চলবে না?" নিশ্চয় জল ছাড়া আমরা পারি বৈ কি! এমন

একটা চাপ দেবার যন্ত্র তৈরি হয়েছে যার দ্বারা আমরা হাঁড়ি বাটি ইত্যাদি অনেক জিনিসই তৈরি করতে পারি, শুধু শুকনো মাটি দিয়ে। এই যন্ত্রে কয়েকটা ইস্পাতের ছাঁচ আছে। তাতে মাটি আর একটা জিনিস দিয়ে চাপ দিতে হয়। কত জোরে চাপ দিতে হয় জান? ধর এই বইখানার উপর এতটা চাপ দিতে হবে, তাহলে আমাদের এই বইখানার উপর চারটে রেলগাড়ির ওয়াগন বসাতে হবে প্রত্যেকটিতে মাল একেবারে ভর্তি থাকা চাই। বুঝতেই পারছ অত বেশী চাপ দেবার জিনিস আমাদের নেই, আর শুধু হাত দিয়েও অত চাপ দেওয়া যায় না।

তেল দিয়ে যেমন কলের মধ্যে দুটো জিনিসের পরস্পর ঘর্ষণ-জনিত বাধার লাঘব হয় সেই রকম জল দিয়ে মাটির দুটো কণার মধ্যে ঘর্ষণ বন্ধ হয়। ছাঁচে ফেলার অর্থ মাটির কণা-গুলোকে নিজের ইচ্ছা মতো সাজিয়ে রাখা, জল দেবার ফলে মাটির কণাগুলো ঠিক এই ভাবেই পরস্পরের সঙ্গে লেগে যায়।

কিন্তু এটাই শেষ কথা নয়। যখন আমরা কোন মাটির দলাকে চাপ দিয়ে কোন জিনিস তৈরি করি তখন তার মানে শুধু এই নয় যে তাকে আমরা একটা বিশেষ আকার দিতে চাই। চাপ দেওয়ার জন্য মাটির কণাগুলো খুব কাছাকাছি চলে আসে। জল এই ব্যাপারে খুব সাহায্য করে। যখন ভিজে মাটি দিয়ে তৈরি জিনিস শুকনো হয় তখন জলটা বাষ্প হয়ে চলে যায়, এতে মাটির কণাগুলো আরও কাছে

আসে আর জিনিসটাও বেশ আঁটসাঁট হয়, যেমন ধর, মাটির ইট শুকোলে প্রায় সিকি ভাগ ছোট হয়ে যায়।

কিন্তু এই ছোট হয়ে যাবার অসুবিধাও আছে, মাটির বাসন অনেক সময়ে শুকোনোর সময় ফেটে যায়, এরকম ধরনের ফাটা আমরা মাঠে-ঘাটে দেখতে পাই। বিশেষ করে বৃষ্টি হয়ে যাওয়ার পর রোদ উঠলে মাঠে অনেক ফাটল দেখা যায়। এগুলো দেখে ভূমিকম্পের সময়ে যে বিরাট ফাটল হয় তার কথা মনে পড়ে। আমাদের কাছে এই ফাটল যত ছোটই হোক না কেন, একটা পিঁপড়ের কাছে এটা বিরাট গহ্বরের মতো আর ফাটলের ভিতরে তাকালে তার গা শিউরে ওঠে।

যাতে মাটি এভাবে না ফেটে যায় তার জন্য মাটির সঙ্গে বালি মেশাতে হয়, বালির কণাগুলো মাটির মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে বেশ শক্তভাবে মাটিটাকে আঁকড়ে ধরে থাকে। ফলে মাটিটা শুকিয়ে ছোট হয়ে যেতে পারে না।

এইবার আমরা মাটির সম্বন্ধে সমস্ত কিছু কথা জানতে পেরেছি, কাজেই নির্ভয়ে কাজ আরম্ভ করতে পারি। খানিকটা মাটি নাও, আর তাতে জল মেশাও। জল কতটা নিতে হবে তার কোন বাঁধাধরা নিয়ম নেই—তবে যতখানি মাটি তার তিন ভাগের একভাগ জল নিলেই ভাল হয়। এইবার মাটি ভাল করে মাখ, দেখবে যদি জল বেশী মেশানো হয়ে থাকে তবে হাতে বড় বেশী লেগে যাবে আর কম হলে মাখা যাবে না।

এবার মাখা মাটিতে একটু মিহি বালি মেশাও, আবার ভাল করে চট্‌কে মাখ যাতে বালি মাটির সঙ্গে ভালভাবে মিশে যায়, যেন বাইরে থেকে বালি দেখতে না পাওয়া যায়। এইবার তোমার হাঁড়ি গড়ার মতো মাটি তৈরি হল। অবশ্য প্রথম বারেই তুমি সফল হবে না। তোমরা জান নিশ্চয় যে মাটি নানা রকমের আছে। কোনটাতে বেশী বালি মেশানো হয় আবার কোনটায় কম। কোন মাটিতে কতটা বালি মেশানো দরকার তা তোমরা ক্রমশ শিখবে। যদি একটা হাঁড়ি ভাল না হয় তবে আর একটা গড়, এমনি করে ক্রমশ তোমরা ভালো হাঁড়ি গড়তে শিখবে।

এইবার তোমার হাঁড়ি তৈরি হল। দেখতে কি রকম বিশ্রী! এটা ঠিক গোল নয়, একদিকটা বেরিয়ে পড়েছে, দাঁতের ব্যথায় ফুলো গালের মতো।

এর চেয়ে ভালো হাঁড়ি গড়া বেশ শক্ত। গড়বার সময় চোখে দেখে ঠিক বোঝা যায় না হাঁড়িটা ঠিক হচ্ছে কিনা। কম্পাস দিয়ে গোল বৃত্ত আঁকা খুব সোজা, কিন্তু বিনা কম্পাসে আঁকতে চেষ্টা কর তো, দেখবে কত শক্ত!

হাঁড়ি-গড়া "চাক" কুমোরদের বাড়ি থাকে; এটা আর কিছুই নয়, প্রকাণ্ড একটা চাকার মতো জিনিস, এই চাকার মাঝখানে একতাল মাটি রেখে কুমোর এটাকে খুব জোরে ঘুরিয়ে দেয়, তারপর বুড়ো আঙুলটা মাঝখানে রেখে অন্য আঙুলগুলো মাটির চারপাশে রাখে, চাকা ঘুরবার সঙ্গে সঙ্গে মাটির মাঝখানটা নিচু হয় আর চারপাশটা দেয়ালের মতো উঁচু

হয়ে ওঠে, আর আঙুলের ঘা লেগে বেশ প্লেন হয়। এই ভাবে মাটির জিনিস তৈরি করাটা কাগজ কম্পাস দিয়ে বৃত্ত আঁকার মতো। কুমোরের হাতটা হল কম্পাস আর চাকটা হল কাগজ, তবে কাগজে বৃত্ত আঁকবার সময় আমরা কাগজটাকে ঠিক রেখে কম্পাসটাকে ঘুরোই, এতে কম্পাসটা চুপ করে থাকে, কাগজটা ঘোরে।



এইবার হাঁড়ি তৈরি হল; এখন এটাকে দিন-দুই শুকোতে দেওয়া হবে। শুকিয়ে গেলে এটাকে পোড়ানো হবে, পোড়ানোর কারণ এই যে, না পোড়ালে কাঁচা মাটির হাঁড়িতে জল রাখা যায় না, কারণ জল দিলেই মাটি গলে আবার কাদা হয়ে যাবে।

পোড়াবার জন্য এই মাটির হাঁড়িটাকে একটা গন্‌গনে আঁচের চুল্লিতে দিতে হবে। এখানে কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ্য রাখা খুব দরকার। হাঁড়িটা যেন খুব ভাল করে শুকিয়ে নেওয়া হয়, যদি তা না হয় তবে আগুনে হাঁড়ি দিলেই চৌচির হয়ে ফেটে যাবে। হাঁড়ির মাটির মধ্যে যে জল আছে সেটা আগুনের ছোঁয়া পাওয়া মাত্র বাষ্প হয়ে যাবে। আগেই বলেছি বাষ্প জলের চেয়ে বেশী জায়গা নেয়। কাজেই হাঁড়ির মাটির মধ্যে সে বাষ্প ধরবে না, হাঁড়ি ফেটে বাষ্প

বের হয়ে আসবে। আগুনে পোড়াবার আগে ভাল ভাবে হাঁড়িটা শুকিয়ে নেওয়া উচিত।

এইবার হাঁড়িটা পোড়াতে দাও। আচ্ছা, পোড়ালে কি হয়? পোড়াবার সময় মাটির টুকরোগুলো পরস্পরের সঙ্গে ভালভাবে জুড়ে যায় ফলে সমস্ত জিনিসটা একটা জিনিস হয়ে যায়। পোড়াবার আগে মাটির কণাগুলো আলগা থাকে, জল লাগলে আবার কাদা হয়ে যায়, পোড়ালে সেটি হবার উপায় নেই। পোড়ানো জিনিসটাকে আবার মাটি করার উপায় নেই।

কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তোমার হাঁড়ি তৈরি হয়ে যাবে। এর রং হবে ইটের মতো লাল, এতে জল ভরলে কিছুমাত্র ক্ষতি হবে না, কিন্তু তবুও এর একটা দোষ থেকে যাবে। এখনও এর মধ্যে জল রাখলে আস্তে আস্তে জল চুইয়ে যাবে। কারণ হল এই যে গায়ে গায়ে জোড়া লাগলেও এখনও মাটির কণার মধ্যে ছোট ছোট ফাঁক থেকে যাবে, জল যার ভিতর দিয়ে আস্তে আস্তে বের হয়ে যাবে। যদি তুমি একটা আসল মাটির হাঁড়ি ভাল করে দেখ তবে দেখবে এর বাইরের দিকে একটা প্রলেপ মতো দেওয়া আছে। এই প্রলেপ দেওয়ার জন্য মাটির ফাঁকগুলো বন্ধ হয়ে যায়। যদি আমরা নিজেদের খুব ছোট করে ফেলতে পারি আর মাটির হাঁড়ির মধ্যে ঢুকতে পারি তবে দেখব আমাদের সামনে আঁকাবাঁকা লম্বা সুড়ঙ্গ মতো রয়েছে। এই সুড়ঙ্গের ডালপালা সমস্ত হাঁড়িটাতেই ছড়িয়ে রয়েছে, এর

ভেতর দিয়ে চল দেখবে একেবারে অন্ধকার, তারপর কিছুদূর গিয়ে আবার আলো। বের হবার জন্য ঐ আলোর কাছে গেলেই আমরা হোঁচট খাব। কারণ ওখানে রাস্তা বন্ধ। ঐ প্রলেপের জন্য ঐখানে ফাঁকটা বন্ধ। কিন্তু তাতে আলো আটকায় না। ভিতরে যেদিক দিয়েই যাই না কেন সব দিকেই ওই এক অবস্থা, হাঁড়িটা যেন একটা পাথরের দুর্গ। সমস্ত রাস্তাটাই একটা স্বচ্ছ জিনিস দিয়ে এমন ভাবে বন্ধ যেন তার ভিতর দিয়ে হাওয়া আসতে না পারে।

বালি আর লবণ জলের সঙ্গে মিশিয়ে তৈরি কর। হাঁড়ি পোড়াবার আগে হাঁড়ির চারপাশে লাগিয়ে দিতে হয়। এই লবণ, বালি মাটির সঙ্গে মিশে চক্‌চকে পালিশ মতো জিনিস তৈরি হয়।

চীনে মাটির বাসন

পঞ্চম স্টেশন

হাঁড়িকুড়ির বনেদী আত্মীয় যারা

মাটির বাসনের সঙ্গে একজাতের যে সব জিনিস তার মধ্যে অ্যালুমিনিয়মের হাঁড়ি, এরোপ্লেন প্রভৃতি নিয়ে তো সে রীতিমতো গর্বই করতে পারে ; তাছাড়া এই ঘরের মধ্যেই চীনে মাটির তৈরি আরও জিনিস আছে যারা তার সগোত্র।

চীনে মাটির বাসনের মধ্যে আছে প্লেট, চায়ের কাপ, ডিশ, চিনির পাত্র, টিপয় ইত্যাদি। সবই সাদা ধপধপ করছে। তাছাড়া আরও একটা অতি সুন্দর জিনিস আছে সেটা হল একটা খাঁটি পোর্সেলিনের জগ। কী সুন্দর চিত্র জগটার গায়ে। লাল নদীর ধারে লাল জেলে লাল ছিপে মাছ ধরছে। আমি যদি বলি রান্নাঘরের সাধারণ মাটির পাত্রটার সঙ্গে এদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে তাহলে তোমরা হেসেই উড়িয়ে দেবে। কিন্তু এটা হাসির কথা নয়। মানুষ যদি সাধারণ মাটির পাত্র তৈরি করতে না জানত তাহলে এই চীনামাটির জিনিসও সে করতে পারত না।

চীনামাটি কে আবিষ্কার করেন?

ইউরোপে ডেনমার্ক, সুইডেন, আর ফ্রান্সে সমুদ্রে

একরকম ছোট ছোট বালির ঢিপির সারি দেখতে পাওয়া যায়। এই ঢিপিগুলো ভেঙে দেখা গিয়েছিল যে তাতে



নানা-রকম জিনিস আছে—মাছের কাঁটা, ঝিনুকের খোলা, জন্তুর মাথার হাড়, পাথরের হাতিয়ার, বল্গাহরিণের হাড় থেকে তৈরি ক্ষুদ্র কুঠার, আরও কত কি! এর থেকে প্রমাণ হয় যে এইসব জায়গায় আদিম মানুষ নিশ্চয়ই বসবাস করেছিল। বোধহয় তাদের সব জঞ্জাল এইখানে ফেলে রাখবার বন্দোবস্ত ছিল। বছরের পর বছর এই-ভাবে জমা হতে হতে এইগুলো মাইলের পর মাইল লম্বা হয়ে উঠল। এই স্তূপগুলোর মধ্যে থেকে মাটির পাত্রের কয়েকটা ভাঙা টুকরোও পাওয়া গিয়েছিল। এগুলো অবশ্য আমাদের ঘরের পাত্রের মতো নয়, এগুলোর তলা চ্যাপ্টা ছিল না, আর সেগুলো তেমন চকচকে পালিস করাও নয়। তবুও এগুলো সত্যিকারের মাটির পাত্রই ছিল।

এর প্রায় হাজার বছর পরে চীনামাটির আবিষ্কার হয়। অবশ্য এত দেরিতে আবিষ্কার হওয়ার কারণ আছে। চীনা-

মাটির পাত্র তৈরি করা সাধারণ মাটির পাত্রের চেয়ে অনেক বেশী শক্ত! প্রায় সতরশ' বছর আগে চীনদেশে সর্বপ্রথম এই জিনিসটা আবিষ্কার হয়। অবশ্য মাত্র পঞ্চ-দশ শতাব্দীতে মিঙ্‌ বংশের রাজত্বের সময় এই জিনিসটার চলন বেশী হয়।

প্রথম প্রথম চীনামাটি ইউরোপে সোনার দরে বিক্রি হয়েছে। কেউ জানত না জিনিসটা কি দিয়ে তৈরি। অনেক কষ্টে একজন রাসায়নিক এই জিনিসটা তৈরি করার উপায় বের করলেন। তবে বারুদ ও ছাপাখানার ব্যাপারে যা হয়েছিল এবারও তাই হল। চীনারা নিজেদের জানা জিনিস অপর দেশের লোককে জানাতে চাইত না। তাই আজকাল লোকে জানে বারথোল্ড সোয়ার্জ (Berthold Schwartz) বারুদ আবিষ্কার করেছেন আর গুটেনবার্গ (Gutenberg) ছাপাখানা আবিষ্কার করেছেন। আসলে এদুটো জিনিসই আবিষ্কার হয়েছিল চীনদেশে। এই রকমই যে অ্যালকেমিস্ট চীনামাটি তৈরি করার নিয়মটা জানতে পারল তাঁর নাম বোয়েটগার (Boettger)।

এই বোয়েটগার ছিলেন স্যাক্সনরাজ আর্থার দি স্ট্রং-এর সভার অ্যালকেমিস্ট। অ্যালকেমিস্ট হল তাঁরা যাঁরা বিশ্বাস করেন যে পরশ পাথর বলে জিনিসটা সত্যিই আছে যা ছোঁয়ালে যে কোন ধাতুই সোনা হয়ে যায়। বছরের পর বছর তাঁরা এই পরশ পাথর খুঁজে বেড়াতেন। অবশ্য শুধু যে তাঁরাই পরশ পাথর বিশ্বাস করতেন তা নয়। অনেক

রাজারাই তাঁদের এই পরশ পাথর খোঁজবার কাজে লাগাতেন, যাতে তাঁদের সাহায্যে রাজভাণ্ডার সোনায় পূর্ণ হয়ে যায়। অথচ পরশ পাথর একেবারে কাল্পনিক জিনিস।

পাছে এই অ্যালকেমিস্টরা অন্য কোথাও পালিয়ে যায় এই ভেবে রাজা সাধারণত তাঁদের বন্দীভাবেই রাখতেন। কখনও কখনও রাজা অপেক্ষা করে করে উত্যক্ত হয়ে পড়তেন। বেচারা অ্যালকেমিস্টদের তখন প্রাণদণ্ড হত। তবে একটা মজার জিনিস হত। এঁদের সাধারণ ফাঁসিকাঠে ফাঁসি দেওয়া হত না—সারা জীবন এঁরা সোনার পেছনে ছুটেছেন, তাই সোনার ফাঁসিকাঠেই এদের ফাঁসি দেওয়া হত। তোমাদের বলে দিতে হবে না—সোনার হোক আর যারই হোক, ফাঁসিকাঠ ফাঁসিকাঠই, এতে ঝুললে মরতেই হবে।

অনেক সময় কিন্তু এই পরশ পাথর খুঁজতে খুঁজতে এরা সত্যিকারের ভাল কিছু আবিষ্কার করে ফেলতেন। বোয়েট-গারের বেলাতেও তাই হল। বোয়েটগারের বয়স যখন চৌদ্দ তখন তিনি হঠাৎ একটা হাতে-লেখা কাগজ পেলেন যাতে এই পরশ পাথর সম্বন্ধে এবং সোনা তৈরি সম্বন্ধে অনেক কিছু লেখা ছিল। সেই যে তার মাথায় পরশ পাথর ঢুকল সেটা আর সহজে গেল না। তবে যদি তিনি একটা লেবোরেটারিতে কাজ করবার সুযোগ না পেতেন তাহলে হয়তো তিনি অন্য কিছু হতেন। তিনি প্রথমে কাজ আরম্ভ করেন একজনের ওষুধের দোকানে। দোকানের মালিকের নাম জোর্ন। প্রত্যেক দিন জোর্ন যখন শুতে যেতেন বোয়েটগারের

তখন গবেষণা আরম্ভ হত, কিন্তু হঠাৎ তিনি একদিন হাতেনাতে ধরা পড়ে গেলেন। জোর্ন হঠাৎ দরজা খুলে ঘরে ঢুকলেন। বোয়েটগারকে বকতে লাগলেন—"এখানে কি করছ, অকর্মার ধাড়ী? আমার অনুমতি না নিয়ে ঐ বড় কাঁচের জিনিসটা ব্যবহার করার স্পর্ধা হল কি করে? ওটা ভাঙলে তোমার সারা বছরের মাইনে দিয়েও ক্ষতিপূরণ হবে না।"

বেচারী বোয়েটগার ভয়ে ভয়ে জবাব দিল—"আমি সোনা তৈরি করতে চেষ্টা করছি।"

জোর্ন বললে—"সোনা তৈরি শিখছ? হতভাগা, তুমি বরং জোড়বার আটা তৈরি শিখলে পারতে। অ্যালকেমিস্টের দরকার আমার নেই। আমার দরকার ওষুধের দোকানের শিক্ষানবিস। তোমার জিনিসপত্র নিয়ে সরে পড়। তোমার বাবাকে বলো যে তোমার এসব মতলব ঘুচিয়ে দিতে।"

বোয়েটগার মুখ চুন করে তার তল্পিতল্পা নিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এলেন। অবশ্য তল্পিতল্পা বলতে দুটো ছেঁড়া পাজামা, কয়েকটা সার্ট আর তার সঙ্গে সযত্নে রাখা সেই হাতে-লেখা বইখানি যাতে সোনা তৈরি করার সন্ধান ছিল।

বাড়িতে তাকে সকলে আদর করে ডেকে নিল না। তার বাপ টাকশালে কাজ করলেও তাদের বাড়িতে টাকা পয়সা বড় একটা দেখা যেত না। যা হোক কয়েক মাস বোয়েটগার কোন রকমে কাটালেন। তারপর আর থাকতে না পেরে

আবার জোর্ন-এর দোরে ধর্ণা দিলেন। তাঁকে অবশ্য কথা দিতে হল যে পরশ পাথর নিয়ে তিনি আর পাগলামি করবেন না। কিন্তু কথা দিলেও মন তাঁর পড়েছিল ঐ জিনিসের ওপর। কাজেই আবার রাত্রিতে লুকিয়ে লুকিয়ে তাঁর গবেষণা চলতে লাগল। এবার অবশ্য তিনি আর একটু বেশী সাবধান হলেন।

কিন্তু জোর্নও চালাক লোক, ফলে বোয়েটগার আবার ধরা পড়লেন আর এবার তাকে কোন কথা বলবার সুযোগ না দিয়েই তাড়িয়ে দেওয়া হল।

বোয়েটগারের অবস্থা তখন শোচনীয়। তিনি বাড়িতেও ফিরতে পারেন না অথচ দোকানেও যেতে পারেন না। এমনভাবে যখন তিনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন তখন হঠাৎ তাঁর কপাল ফিরে গেল। তার সঙ্গে প্রিন্স ফন ফার্স্টেনবার্গ বলে একজন বড়লোকের হঠাৎ দেখা হল। এই লোকটি যখন এই ষোল বছরের ছেলেটার গবেষণার কথা শুনলেন তখন তাঁর হঠাৎ একটু কৌতূহল হল। তিনি বোয়েটগারকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলেন আর তাঁর গবেষণার জন্যে একটা খাঁটি ল্যাবরেটারি তৈরি করে দিলেন। বোয়েটগারের কপাল ফিরল। তাকে ভাল পোশাক দেওয়া হল, পয়সা দেওয়া হল, থাকবার জায়গা দেওয়া হল।

এই খবরটা ক্রমশ জোর্নও শুনল। শুনেই সে তার দোকানের খদ্দেরদের বলতে লাগলে, আমি আগেই বলেছিলাম ছেলেটা সোনার টুকরো। আর হবে নাই বা কেন, কার

কাছে শিখেছে দেখতে হবে তো ? আমি তো আর যে সে লোক্ নই।

বছরের পর বছর চলে যেতে লাগল। বোয়েটগারের দাড়ি গজাল, কিন্তু তবু কিছু হল না। সেই বড় লোকটি যদিও প্রথমে খুবই সহানুভূতি দেখিয়েছিলেন—তিনি ক্রমশ সন্দেহ করতে লাগলেন যে লোকটি জোচ্চোর, কিছু জানে না, তাকে বাজে কথা বলে ঠকাচ্ছে। সে যুগে জোচ্চোরদের কঠোর শাস্তি দেওয়া হত।

ব্যাপারটা বুঝতে পেরে বোয়েটগার পালালেন কিন্তু ধরা পড়ে গেলেন। প্রিন্সের লোকেরা তাঁকে ধরে নিয়ে এল—তাঁকে আবার কাজ করতে হল। মজার কথা একেই বলে। ওষুধের দোকান থেকে তাকে তাড়ানো হয়েছিল এই বিষয়ে গবেষণা করার জন্য, আর এখানে তাকে কঠোর শাস্তির ভয় দেখানো হল যদি সে সেই গবেষণা চালিয়ে না যায় তাহলে।

অবশেষে একদিন তাকে হুকুম দেওয়া হল সোনা তৈরির নিয়মটা লিখে দেওয়ার জন্য। এবার তিনি সত্যিই জোচ্চোরি করলেন। তিনি প্রকাণ্ড অঙ্ক টঙ্ক করে একটা নিয়ম লিখলেন যার সবটাই বাজে। আর লোকে তার সেই ধাপ্পা ধরে ফেলল। রাজার কাছে খবর গেল, রাজা জেলে দিলেন।

জোর্ন যখন একথা শুনলে তখন আবার তার খদ্দেরদের বলতে লাগল ঃ "আমি তো প্রথম থেকেই বলেছি বোয়েটগার

একটা জোচ্চোর। সাধে কি আমি তাকে তাড়িয়ে দেই। আমি জানি ওর শেষ হবে ফাঁসিকাঠে।"

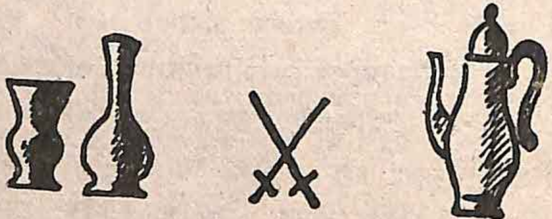
কিন্তু জোর্ন এবারও ভুল করলে। বোয়েটগারের কপাল ভালই বলতে হবে। কাউন্ট সার্নহৌস (Count Tschirnhaus) বলে একজন ভদ্রলোক রাজার কাছে বললেন,—"একে চীনামাটি কি করে তৈরি করে তাই আবিষ্কার করতে দেওয়া হোক, কেননা চীনামাটি তো সোনার মতোই দামী। এ যদি চীনামাটি তৈরি করতে পারে তাহলে সেটা কম লাভের কথা নয়।" এই সময়েই আবার রাজা আগস্ট প্রাশিয়ার রাজাকে ৪৮টি চীনা মাটির বাসন উপহার দিয়েছিলেন।

এই কাজে কিন্তু বোয়েটগার কৃতকার্য হলেন। তিনি মিসেন মাটি থেকে একরকম চীনামাটি তৈরি করলেন। এগুলো অবশ্য চীন দেশের তৈরি জিনিসের মতো এত সাদা না হলেও, এগুলো চীনামাটিই ছিল। আবিষ্কর্তাকে অনেক টাকা উপহার দেওয়া হল। কিন্তু তাঁকে মুক্তি দেওয়া হল না। চীনামাটি তৈরি করার নিয়মকে রাষ্ট্রের গোপন-বস্তু বলে ঘোষণা করা হল। আর বোয়েটগার আর তিনজন সহকারীর ওপর নজর রাখা হল যেন তাঁরা আসামী।

প্রথম প্রথম চীনামাটির জিনিস কেবল রাজারাই ব্যবহার করতেন। স্যাকসন রাজ তাঁর বন্ধু রাজাদের প্রত্যেকের কাছেই চীনামাটির বাসন উপহার পাঠাতে লাগলেন। অবশেষে ১৭০৭ সালে লাইপজিগের বাজারে সর্বপ্রথম চীনামাটির বাসন বিক্রি হল। চীনামাটি তৈরি করার

জন্য মিসেনে অ্যালব্রেখ্‌টবার্গ দুর্গে একটা প্রকাণ্ড কারখানা তৈরি করা হল, আর এখানে কাজ করার সময়ই বোয়েটগার সাদা চীনামাটি বার করতে পারলেন। ফলে মিসেনের জিনিসগুলো এত চমৎকার হল যে, আসল চীনামাটি আর মিসেনে তৈরি চীনামাটির তফাত একমাত্র বোঝা যেত জিনিসগুলোর গায়ের একটি চিত্র—আড়াআড়িভাবে আঁকা দুখানি তরবারি থেকে।

বোয়েটগার অনেকদিন মিসেন দুর্গে বন্দী হিসাবে কাটালেন। তাকে অবশ্য অন্য সব সুবিধাই দেওয়া হত। কিন্তু তার এসব ভাল লাগত না। কাজেই বৃদ্ধ বয়সে তিনি আবার



পালাবার চেষ্টা করলেন। প্রাশিয়ার রাজার সঙ্গে তিনি গোপনে নিজের মুক্তির জন্য চিঠিপত্র চালাতে লাগলেন। কিন্তু শেষে তিনি ধরা পড়লেন। তাঁকে জেলে রাখা হল আর ঠিক হল তাঁকে ফাঁসি দেওয়া হবে।

কিন্তু বোয়েটগারের কপাল ভাল ছিল। জেলে হঠাৎ তার শরীর খারাপ হয়ে গেল আর তাতেই তিনি মারা গেলেন, তাঁকে আর ফাঁসির দড়ি গলায় পরতে হল না!

চীনামাটি কি করে তৈরি হয় ?

এখন তোমাদের নিশ্চয়ই জানতে ইচ্ছে হচ্ছে যে, যে চীনামাটি তৈরি নিয়ে এত গোপনীয়তা সেই চীনামাটি কি করে তৈরি করে। যে গোপন কথার জন্যে রোয়েটগারকে বন্দী করে রাখা হল, সেই গোপন কথাটি কি !

গোপন কথা অবশ্য একটি নয়, অনেকগুলো। প্রথম হল পরিষ্কার ভাল মাটি জোগাড় করা। লোকে বলে এর জন্যে বোয়েটগারকে পরিশ্রম করতে হয়নি। হঠাৎ তিনি এক রকম ভাল মাটির সন্ধান পেয়ে যান। একদিন তার পরচুলায় পাউডার লাগাতে লাগাতে বোয়েটগার হঠাৎ আবিষ্কার করলেন যে ঐ পাউডার আসলে পাউডার নয়, এক রকম পরিষ্কার মাটি। আর এই ভাল মাটি মিসেনের কাছাকাছি যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। বোয়েটগার এই মাটি দিয়েই চীনামাটি তৈরি করতে চেষ্টা করে সফল হলেন।

গল্পটা হয়তো সত্যি নয়। হয়তো এইভাবে তিনি ভাল মাটির সন্ধান পাননি। কিন্তু আসল কথাটা এই যে একবার ভাল মাটির সন্ধান পেলে অন্য সব কাজ সোজা হয়ে যায়।

দ্বিতীয় সমস্যাটা বেশ শক্ত। এই মাটির সঙ্গে মেশাবার জন্যে পরিষ্কার মিহি বালি চাই, আর অভ্র কিংবা ফেলস্‌পার। সাধারণ মাটির জিনিসেও যেমন বালি না মেশালে ফেটে যায়, চীনামাটি তৈরি করতে ঠিক ঐ জন্যেই বালি মেশাতে হয়।

আর যাতে মাটিটা বেশ ভালভাবে মিশে যায় তার জন্যে দরকার হয় অভ্র বা ফেলস্পার।

তৃতীয় গোপন কথা হল এই যে, এই বালি বা অভ্র এগুলোকে ভাল করে গুঁড়ো করে ছেঁকে নিতে হয়। উদ্দেশ্য এই যে যেন এর সঙ্গে অন্য কোন জিনিস না থাকে, আর জিনিসটাও খুব মিহি হয়। মাটি ভাল করে বেছে নেবার জন্যে আমরা যা করেছিলাম এবার ঠিক তাই করতে হবে। প্রথমেই এই বালি আর অভ্র ঢেলে দিলে তার বড় বড় টুকরোগুলো নীচে পড়বে—সেগুলো তক্ষুনি ফেলে দিতে হবে। তার পর আস্তে আস্তে জলের নীচে যে মিহি বালির তলানি পড়বে সেগুলোই আমাদের দরকার। মাটি থেকে অন্য জিনিস বাদ দেবার জন্যেও এই রকম করতে হয়।

তারপর মাটি, বালি আর অভ্রের এই মিহি গুঁড়ো একসঙ্গে বেশ ভাল করে আটার মতো মাখতে হয়। তারপর কুমোরের চাকের ওপর বসিয়ে নিজের ইচ্ছামতো বাসন গড়তে হয়। এই বাসন গড়া আর শুকোনোর ব্যাপার শক্ত কিছুই নয়। সাধারণ মাটির হাঁড়ি কলসী যেভাবে করতে হয় ঠিক সেই ভাবেই করতে হয়, তবে পুড়বার সময় ব্যাপারটা হয় একেবারে অন্য রকম। তখন দক্ষতার দরকার হয়।

চীনামাটি পোড়াতে হয় দুবার। প্রথমবার অল্প আঁচে আর দ্বিতীয়বার গনগনে আগুনে। প্রায় গলিয়ে দেওয়ার মতো গরমে এটা পোড়াতে হয়। কিন্তু এই বেশী আঁচে পোড়াবার সময় কি হয় জান? অত যত্নে গড়া বাসনগুলো

নরম হয়ে যায়, ফলে তার চেহারা অন্যরকম হয়ে যায়। এই জন্যেই পোড়াবার সময় নানান রকম বাক্স, ছাঁচ ইত্যাদির দরকার হয়। এইগুলোর ফলে জিনিসটা কোন দিকে বেঁকে যেতে পারে না। অনেক সাবধান হওয়া সত্ত্বেও পোড়াবার সময় অনেক চীনামাটির জিনিস নষ্ট হয়ে যায়।

চীনামাটির বাসন তৈরি করার ব্যাপারে সর্বশেষ গোপন কথা হল এই যে চীনামাটির জিনিস যার জন্যে চক্‌চক করে, সেই বার্নিস মতো জিনিসটা নীচে থেকে ভাল করে মুছে ফেলতে হয়। তা না হলে বাসন ফ্রেমের সঙ্গে এঁটে যায় আর এত শক্ত হয়ে তার সঙ্গে লেগে থাকে যে না ভেঙে উপায় নেই।

তোমরা হয়তো বলবে অত আঁচে চীনামাটি পোড়ানো কেন? কম আঁচে পোড়ালে ক্ষতি হয়? এর উত্তর হল এই যে, চীনামাটির বিশেষত্বই হচ্ছে বেশী আঁচে পোড়ানো। তোমরা মাটির বাসন দেখেছ নিশ্চয়ই। ফুলদানি, টি-পট আর নানান রকমের খেলনার সঙ্গে চীনামাটির পার্থক্য হল এই যে, প্রথমটা নরম আঁচে পোড়ানো হয় আর দ্বিতীয়টা বেশী আঁচে পোড়ানো হয়।

মাটির পাত্র আর চীনামাটির বাসনে তফাত কি?

তফাত শুধু এই : চীনামাটির জিনিস কাঁচের মতো একটি রন্ধ্রহীন জিনিস। যে ছোট ছোট কণা দিয়ে এটা তৈরি হয়েছে সেগুলো গলে গিয়ে পরস্পরের গায়ে এমনভাবে

লেগে থাকে যেন সে সমস্তটাই একটা জিনিস বলে মনে হয়। মাটির জিনিস কিন্তু সে রকম নয়। এর অংশগুলো আল্‌গা আল্‌গা। গরম আঁচে গলানর জন্যই চীনামাটির সমস্ত অংশ-গুলো জমাট হয়ে ওঠে। চক্‌চকেও এইজন্য।

কোন পাত্রটা মাটির আর কোনটা চীনামাটির তা বুঝবার একটা সোজা উপায় আছে। আলোর সামনে ধরলে যদি তাতে আলো ঠিক্‌রে পড়ে তবে বুঝবে সেটা চীনামাটির। তা না হলে সেটা মাটির। আরও একটা উপায় হচ্ছে পাত্রের তলাটা দেখা। যদি তার ধারটা চক্‌চকে পালিশ করা হয় তাহলে বুঝতে হবে সেটা মাটির। আর যদি দেখা যায় যে ধারের কাছটার পালিশ তুলে দেওয়া হয়েছে তবে সেটা চীনামাটির।

যেখানে কাপ প্লেট ইত্যাদি থাকে সেখানে কি এমন জিনিস আছে যা বালির তৈরি?

যেখানে চীনামাটির জিনিস থাকে সেখানে নজর করেছ কি? সেখানে নিশ্চয়ই কয়েকটা কাঁচের গ্লাস লবণদানি ইত্যাদিও আছে। এই কাঁচের জিনিসগুলোই বালির তৈরি। কথাটা একটু আশ্চর্য শোনায় না? কিন্তু কথাটা ঠিক। কাঁচ তৈরি হয় সাধারণ বালি থেকে। আর শুধু গ্লাস নয়, আজকাল আস্ত বাড়িই শুধু কাঁচ আর লোহা দিয়ে তৈরি হয়। যেমন ধর, লণ্ডনে একটা বাড়ি আছে, তার নাম 'ক্রিস্টাল প্যালেস'। এটা এত উঁচু আর এতটা জায়গা জোড়া যে এই বাড়ির ঘরের

মধ্যেই বড় বড় গাছ জন্মায়। এই কাঁচের বাড়িটা এখনও দাঁড়িয়ে আছে যদিও এর অর্ধেকটাই বালির তৈরি।

~দী কঠিন অথচ তরল পদার্থ

সাধারণ কাঁচের বোতল তৈরি করার জন্য একটা মাটির পাত্রে বালি রাখা হয়। তারপর তাতে সোডা আর ফুলখড়ি দেওয়া হয়। এইবার এটা একরকম বিশেষ ধরনের চুল্লীতে রাখা হয়। এই মাটির পাত্রটা অবশ্য এমন মাটি দিয়ে তৈরি যা খুব গরমেও গলে যায় না। যখন এই জিনিসগুলো তেতে লাল হয়ে যায় তখন বালি, সোডা আর খড়ি এই তিনটে জিনিসই গলে বেশ মিশে যায়। ফলে আমরা গলানো কাঁচ পাই। এই জিনিসটা জলের মতোই তরল।

কিন্তু এই জিনিসটা দেখতে কেবল জলের মতো। যখন এটা ঠাণ্ডা হয়ে যায় তখন এটা একেবারে অন্য জিনিস হয়ে যায়। তোমরা জান জল ঠাণ্ডা হলেও তরল থাকে। অবশ্য উত্তাপ যখন ৩২° ডিগ্রি ফারেনহাইট-এর কম হয় তখনই জল জমে বরফ হয়ে যায়।

গলা কাঁচের ব্যবহার কিন্তু অন্য রকম। ঠাণ্ডা হবার সঙ্গে সঙ্গে কাঁচ যখন ঘন হতে থাকে, উত্তাপ যখন ২১৯২° (ফ) ডিগ্রি তখন এটা প্রায় সিরাপের মতো হয়; ১৮৩২° ডিগ্রিতে (ফ) তখন সুতো সুতো মতো হয়। ১০৭২° ডিগ্রি (ফ)-তেও বেশ নরম থাকে। তারপর ক্রমশ পিচের মতো ঘন হতে হতে শক্ত কাঁচ হয়ে দাঁড়ায়।

কাজেই আমরা বলতে পারি না ঠিক কত ডিগ্রি উত্তাপে কাঁচ গলে আর কত ডিগ্রিতে জমে। এই জন্যই কাঁচকে অনেক সময় কঠিন তরল জিনিস বলা হয়। যেমন "সাদা ঝুল" কিংবা "গরম বরফ" অর্থহীন মনে এই কথাটাও তেমনি। যদি কাঁচ এই রকম কঠিন তরল নিস না হত তাহলে কাঁচ দিয়ে পেটমোটা কুঁজো, নক্‌শা-কাটা গ্লাস, সুদৃশ্য ফুলদানি ইত্যাদি তৈরি করা একেবারেই সম্ভব হত না।

একটি বুদ্‌বুদ্‌ তৈরির কারখানা

ইংরাজিতে একটা কথা আছে, "লোহা গরম থাকতে তাতে ঘা দাও।" কাঁচের সম্বন্ধেও এই একটা কথা বলা যায়, "কাঁচ যখন গরম থাকে তাতে ফুঁ দাও।" বোধহয় তোমরা জান না বেশীর ভাগ কাঁচের জিনিসই এইভাবে ফুঁ দিয়ে তৈরি করতে হয়, ঠিক যেভাবে ফুঁ দিয়ে তোমরা সাবানের বুদ্‌বুদ্‌ তৈরি কর। তবে সাবানের বুদ্‌বুদ্‌ তৈরি করতে হলে যে কোনো জিনিসের সরু নল হলেই চলে। কাঁচের জিনিস তৈরি করতে একটা লম্বা লোহার নল দরকার হয়। এর মুখটা আবার কাঠের তৈরি হওয়া চাই।

গলা কাঁচ যখন কিছুটা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে তখন কারিগর ঐ নলের আগায় এক টুকরো গলিত নরম কাঁচ নিয়ে তাতে ফুঁ দিতে আরম্ভ করে; ফলে একটা কাঁচের বুদ্‌বুদ তৈরি হয়। এই বুদ্‌বুদ্‌ দিয়ে ইচ্ছা মতো গ্লাস, বোতল, শার্সি বা অন্য কিছু তৈরি করা যায়। ধর তাকে একটা বোতল তৈরি করতে হবে।

সে একটা বোতলের ছাঁচ এনে তার মধ্যে ঐ বুদ্‌বুদ্‌টা রেখে প্রাণপনে ফুঁ দেবে যতক্ষণ না ঐ বুদ্‌বুদের চারপাশ ছাঁচের গায়ে লাগে। এইভাবে ওটাকে রেখে দেওয়া হয়—তারপর



ঠাণ্ডা হলে ছাঁচটা খুলে ফেলা হয়। একজন পাকা কারিগর এই সামান্য নল দিয়েই নানান চেহারার বোতল তৈরি করতে পারে। তোমরা কেউ ল্যাবোরেটারির কাঁচের জিনিসগুলো দেখেছ? এগুলো সবই ঐভাবে ফুঁ দিয়ে তৈরি করা।

ফুঁ দিয়ে কাঁচের জিনিস তৈরি করা কিন্তু শক্ত কাজ আর স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকরও বটে। এইজন্য বড় বড় কারখানায় যেখানে অনেক জিনিস তৈরি হয় সেখানে ফুঁ দেবার কল ব্যবহার করা হয়। প্রায় ২০ বছর আগে একটা ভাল যন্ত্র বের হয়েছে, এতে তুজন লোকের দরকার হয় অথচ কাজ হয় প্রায় ৮০ জন লোকের মতো। এই যন্ত্র দিয়ে দিনে প্রায় বিশ হাজার বোতল তৈরি হয়।

কিন্তু ফুঁ দেওয়া কাঁচের জিনিস তৈরির একটা কাজ মাত্র। আরও একটা বড় কাজ হল এগুলোকে ঠাণ্ডা করা। যদি একটা কাঁচের দণ্ড আগুনের ওপর ধরা যায় তবে শীঘ্রই সেটা গলে যাবে। এখন এই এক ফোঁটা গলানো কাঁচ যদি ঠাণ্ডা জলের মধ্যে ফেলা যায় তাহলে একটা ছোট্ট গোল জিনিস পাওয়া যাবে। এই কাঁচের একটা টুকরো ভেঙে নাও, দেখবে বাকিটা গুঁড়িয়ে ধুলো হয়ে যাবে। কাজেই বুঝতে পারছ কাঁচ যদি খুব তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা করা যায় তাহলে কত ঠুনকো হয়ে যায়।

কাঁচ যাতে এরকম না হয় এইজন্য কাঁচের তৈরি জিনিস এক রকম বিশেষ ধরনের তৈরি চুল্লীতে রাখা হয়। এখানে কাঁচ খুব আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা হয়।

কোন কোন কাঁচের জিনিস যেমন গ্লাস, ফুলদানি ইত্যাদিতে পল কেটে দেওয়া হয়। তারপর পাশগুলো পাথরের সঙ্গে ঘষে সমান করে দেওয়া হয়। প্রথম প্রথম এই পাশগুলো ভাল দেখায় না কিন্তু পরে পালিশ করে দিলে বেশ পরিষ্কার আর চক্চকে হয়ে যায়।

অনেক সময় অন্য রকমেও কাঁচের জিনিস তৈরি হয়। লোহা ঢালাই করার মতো ছাঁচের মধ্যে ঢেলেও অনেক সময় কাঁচের জিনিস তৈরি হয়। এই রকম ছাঁচে-ঢালা আর পল-কাটা গ্লাসের তফাত অতি সহজেই জানা যায়। সাধারণত পল-কাটা গ্লাসের কোণগুলো সোজা সোজা থাকে, ছাঁচে-ঢালা গ্লাসের ধারগুলো কিন্তু গোল করা থাকে। এও একটা মনে

রাখবার মতো দরকারী জিনিস। অনেক সময় আমাদের হয় তো দামী পল-কাটা গ্লাস আর সস্তা ছাঁচে-ঢালা কাঁচের গ্লাসের তফাত জানা দরকার হয়ে পড়ে।

প্রকাণ্ড আর্শির কাঁচ এইরকমই ফুঁ দেওয়ার বদলে ছাঁচে ঢেলে তৈরি করা হয়। প্রথমে প্রকাণ্ড এক কাঁচ তৈরি করে তাকে ঘষে ঘষে প্লেন করা হয়। তারপর তাকে পালিশ করা হয়।

অবশ্য তৈরি করার নিয়মের পার্থক্যের উপর যে কাঁচের দোষ গুণ নির্ভর করে, তা নয়। নানান রকমের কাঁচই আছে। যেমন ধর, নীল রং-এর বোতল তৈরি করা হয় যে কাঁচ দিয়ে সেটা তৈরি হয় সাধারণ হলদে রং-এর বালি, সোডা, আর খড়ি-মাটি দিয়ে। এই বালিতে অনেকখানি লোহার মরচে মিশানো থাকে। তার জন্যই এর রং হলদে। আগুনে গলালে এই হলদে রংটা সবুজ রং হয়ে যায়। অর্থাৎ কাঁচের সবুজ রং থাকা মানেই তাতে লোহার অংশ আছে প্রমাণ হয়।

জানালার সাদা কাঁচের জন্য আরও সাদা বালি লাগে। খুব উঁচু দরের কাঁচ তৈরি করার জন্য একেবারে প্রথম শ্রেণীর সাদা বালি দরকার—এর সঙ্গে সোডার বদলে পটাস আর খড়ি-মাটির বদলে চুন বা লাল সীসা দিতে হয়। এ দিয়ে ভারি কাঁচ তৈরি হয়, আর এ থেকে হীরের মতো আলো ঠিক্‌রে ঠিক্‌রে পড়ে। এই কাঁচকে বলা হয় স্ফটিক।

যে-কাঁচ ভাঙে না

কাঁচ তৈরি করতে অন্য জিনিস লাগুক আর না লাগুক

বালি লাগবেই। কাজেই কাঁচ তৈরি করার সবচেয়ে বড় সমস্যা হল কি করে খুব ভাল বালি পাওয়া যায় ও তা গলানো যায়। তাই ভাল কাঁচ তৈরি করা বেশ শক্ত হয়ে উঠেছিল। অবশেষে প্রায় পঁচিশ বছর আগে হঠাৎ একজন আবিষ্কার করলেন যে গলানো বালি কিংবা কোয়ার্টজ বা স্ফটিক দিয়ে তৈরি জিনিস কাঁচের তৈরি জিনিসের চেয়ে অনেক বেশী মজবুত। একে আগুনে গরম করে লাল করে হঠাৎ ঠাণ্ডা জলে ফেললেও এর কোনো ক্ষতি হয় না। কিন্তু স্ফটিকের জিনিস বড্ড বেশী দামী। কেননা একমাত্র খুব বেশী পাওয়ারের ইলেক্ট্রিক উনুন ছাড়া অন্য কিছুতে এ জিনিস গলানো যায় না।

তবে স্ফটিকই আমাদের ভাবী কালের কাঁচ। গত যুদ্ধের সময় আমেরিকায় আবার আর এক নূতন রকম কাঁচ বেরিয়েছিল। একে বলা হয় "পাইরেক্স"। ৩৯২ ডিগ্রি (ফ) পর্যন্ত গরম করে হঠাৎ বরফ জলে ফেললেও এ কাঁচ ফেটে যায় না।

পোশাক-পরিচ্ছদের আলমারি

ষষ্ঠ স্টেশন

বেড়ানো শেষ হয়ে এল

আমাদের বেড়ানো প্রায় শেষ হয়ে এল। এবার এল শেষ স্টেশন অর্থাৎ আমাদের জামাকাপড়ের আলমারি। এই আলমারি অবশ্য নানা রকমের হয়। কোনোটা এত বড় যে লুকোচুরি খেলার সময় তাতেই ছয়জন লোক অনায়াসে লুকিয়ে থাকতে পারে। আবার কোনটা এত ছোট যে তাতে নেহাৎ শিশুও ঢুকতে পারে না। কোনো আলমারির সামনে প্রকাণ্ড আর্শি, কোনোটায় আবার সে সব কিছুর বালাই নেই। আমাদের আলমারি অবশ্য খুব বড়ও নয়, খুব ছোটও নয়। এতে কাপড়জামা রাখবার আলাদা আলাদা জায়গা আছে। আর এর কপাটে একটা মাঝারি সাইজের আর্শি আছে। আলমারির ভিতরটা দেখবার আগে আয়নাটার বিষয় ভাল করে বোঝা যাক।

আয়নার ইতিহাস

অনেকদিন আগে যখন কাঁচের আয়না আবিষ্কার হয়নি, লোকে চক্‌চকে পেটমোটা ধাতুর পাত্র দিয়ে আয়নার কাজ চালাত। সাধারণত এগুলি রূপা বা তামা আর টিনের

মিশ্রিত ধাতু দিয়ে তৈরি হত। এই ধাতুর আয়নাগুলোর একটা বড় দোষ ছিল এই যে খোলা হাওয়ায় রাখলে এগুলো কালো হয়ে যেত।

অবশেষে একজন আবিষ্কার করলেন যে ধাতুর আয়নার সামনেটা যদি কাঁচ দিয়ে ঢেকে দেওয়া যায় তবে সেগুলো শিগগির কালো হয় না, যেমন ফটো বাঁধানোর সময় করা হয়।

এর পরেই হল কাঁচের আয়নার আবিষ্কার।

অনেকদিন পর্যন্ত আয়না তৈরি করার জন্য একখণ্ড কাঁচের ওপর একটা টিনের রাংতা মুড়ে দিয়ে তার উপর পারা ঢেলে দেওয়া হত। পারা দেওয়ার জন্য টিন গলে কাঁচের গায়ে আটকে যেত। তারপর যেটুকু পারা বেশী হত সেটুকু গড়িয়ে ফেলে দেওয়া হত। একাজ কিন্তু বড় বেশী সময়সাধ্য ছিল। একটা আয়নার পেছনে পারা লাগাতে প্রায় একমাস সময় লেগে যেত।

তারপর একজন বৈজ্ঞানিক, নাম তার লিবিগ (Liebig), তিনি একটা ভাল উপায় বের করলেন। একখণ্ড কাঁচের ওপর তিনি একটা রূপোমেশানো তরল জিনিস ঢেলে দিলেন। এতে আধঘণ্টার মধ্যেই কাঁচের ওপর একটা চক্‌চকে প্রলেপ পড়ে যায়। এই প্রলেপের ওপর একটা রঙের প্রলেপ দেওয়া হয় যাতে এই রূপোটা নষ্ট না হয়ে যায়।

পারার চেয়ে রূপো লাগানো অনেক হিসাবে ভাল। প্রথমত রূপো পারার মতো বিষাক্ত নয়; তাছাড়া রূপো-দেওয়া আয়না অনেক বেশী চকচকে। পারার তৈরি একটা আয়না

আর রূপো-দেওয়া একটা আয়না যদি পাশাপাশি রাখা যায়, তবে দেখা যাবে এ দুটোর মধ্যে রূপোরটা অনেক বেশী উজ্জ্বল। এইজন্যে একটা পারা লাগানো আয়নায় ২৫ পাওয়ারের ইলেক্‌ট্রিক বালবের যে ছায়া পড়ে সেটাকে ১৬ পাওয়ারের বলে মনে হয়।

ওপরের বর্ণনা থেকে বোঝা যাবে আয়না তৈরি করা এমন কিছু শক্ত কাজ নয়—অথচ মাত্র তিনশ বছর আগেও পৃথিবীর মধ্যে একটিমাত্র শহর ছিল যেখানে আয়না তৈরি হত—সে শহর হচ্ছে ভেনিস। সেখানকার লোকেরা আবার আয়না তৈরি করার নিয়ম কাউকে জানাত না। তখন সেখানে আইন করে দেওয়াও হয়েছিল যে, যে কোন বিদেশীর কাছে আয়না তৈরি করার নিয়ম বলে দেবে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে। আর আয়নাও তখন তৈরি হত মুরানো বলে একটা দ্বীপে—সে দ্বীপে বিদেশীদের ঢুকবার কোন অধিকার ছিল না।

এক সময়ের কথা আমরা জানি যখন এই মুরানো দ্বীপে চল্লিশটা বিরাট কারখানা ছিল। এতে হাজার হাজার লোক কাজ করত। আর আয়নাও তৈরি হত প্রচুর। শুধু ফ্রান্সই বছরে প্রায় দুশো বাক্স আয়না আমদানি করত। এই আয়না ছাড়াও এই কারখানাগুলিতে সাদা আর রঙীন কাঁচের জিনিস তৈরি হত। ভেনিসের কাঁচের জিনিস তখন সত্যিই অপূর্ব ছিল। বিশেষ করে চিমনি আর ফুলদানি—তাতে এত পরিষ্কার কাজ করা থাকত

যে তোমরা দেখলে নিশ্চয়ই ভাবতে কাঁচের মতো ঠুনকো জিনিস দিয়ে কি করে এগুলো তৈরি হয়।

মুরানো দ্বীপের কাঁচ-শিল্পের শ্রমিকরা ভিনিসীয় প্রজাতন্ত্রে সে সময় সর্বোচ্চ সম্মান পেত। উচ্চ রাজকর্মচারীর মতোই তাদের খাতির ছিল। এই দ্বীপের শাসনকার্য পরিচালিত হত শ্রমিকদের দ্বারা নির্বাচিত "কাউন্সিল" দ্বারা। ভেনিসে পুলিশকে সকলে যমের মতো ভয় করত—মুরানো দ্বীপে কিন্তু পুলিশের কোন ক্ষমতা ছিল না। তবে মুরানো দ্বীপের লোকেদের একটা বাধা ছিল—সেটা হচ্ছে এই যে ওখানকার লোক বিদেশে যেতে পারত না—গেলে আর ধরা পড়লে তার শাস্তি মৃত্যু। আর শুধু যে পলাতক লোকটিকেই শাস্তি দেওয়া হত তাই নয়—তার পরিবারের সকলকেই চরম শাস্তি দেওয়া হত। কিন্তু এত কঠোর নিয়ম সত্ত্বেও ভেনিসের লোকেরা কাঁচ তৈরির নিয়মটাকে গোপন রাখতে পারল না।

ভেনিসে যে ফরাসী রাষ্ট্রদূত থাকতেন তাঁর কাছে একটা গোপন চিঠি এল ফরাসীদেশের ক্ষমতাশালী মন্ত্রী কোলবার্তের কাছ থেকে। তিনি রাষ্ট্রদূতকে হুকুম করলেন যে ফরাসী দেশের রাজা যে আয়নার কারখানা করেছেন তার জন্য যেমন করে হোক কয়েকজন কারিগর চাই। তখনকার দিনে কারখানা বলতে বড় একটা ওয়ার্কশপই বোঝাত। বড়-গুলোতে বেশী লোক কাজ করত, ছোটগুলোতে কম লোক কাজ করত। এ ছিল যন্ত্রযুগের আগের অবস্থা।

রাষ্ট্রদূতের মাথায় বাজ পড়ল। কারণ তিনি জানতেন

মুরানো থেকে কোনো কারিগরকে বাইরে নিয়ে যাওয়ার মানে কি। ভেনিসের আইনে তখন স্পষ্টই লেখা ছিল ঃ "যদি কোন কাঁচশিল্পী অন্য কোন দেশে কাজ নেয় তবে তাকে ফিরে আসতে বলা হবে। যদি সে কথা না শোনে তবে তার আত্মীয়স্বজনকে কারারুদ্ধ করা হবে। এতেও যদি সে না ফেরে তাহলে গুপ্তঘাতক পাঠিয়ে তাকে মেরে ফেলা হবে।" রাষ্ট্রদূত বুঝেছিলেন যে যদিও বা তিনি কোন কারিগরকে ভুলিয়ে নিয়ে যেতে পারেন, কিন্তু ব্যাপারটা তো আর গোপন থাকবে না ; তাছাড়া—তিনি নিজে যে দেশে দূত হিসাবে আছেন সে দেশের আইন কি করে ভাঙবেন ?

কিন্তু তাহলেও সেদিন সন্ধ্যাবেলাতেই দেখা গেল একটা ঢাকা নৌকো এসে রাষ্ট্রদূতের বাড়ির গায়ে থামল। আর কালো পোশাকে সর্বাঙ্গ ঢাকা একটা বেঁটে কালো লোক নৌকো থেকে নেমে রাষ্ট্রদূতের বাড়িতে ঢুকল। কয়েক ঘণ্টা পরে তাকে ফিরতে দেখা গেল। তারপর প্রায় রোজই এই রহস্যজনক লোকটি সন্ধ্যার অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে দেখা করে যেত। ভেতরের ব্যাপার জানতে পারলে দেখা যেত যে এই লোকটি (যে আসলে মুরানো দ্বীপের একটা ছোট কাঁচের দোকানের মালিক) আর রাষ্ট্রদূত খুব অভিনিবেশের সঙ্গে গল্প করে চলেছে। কি কথা দুজনে হত তা কেউ জানত না। কিন্তু যা ঘটল তা হচ্ছে এই যে প্রায় সপ্তাহখানেক পরে রাষ্ট্রদূতের কাছ থেকে ফরাসী মন্ত্রীর কাছে চিঠি গেল যে, চারজন কাঁচের কারিগর

ফরাসী দেশে যেতে রাজী হয়েছে, আর তাদের পালাবার সব ব্যবস্থা ঠিক।

আরো কয়েক সপ্তাহ পরে এক অন্ধকার রাত্রিতে একখানা নৌকো প্রায় কুড়িজন সশস্ত্র সৈনিক নিয়ে মুরানো দ্বীপে থামল। অন্ধকার দ্বীপের দিক থেকে ঐ দোকানদারদের সঙ্গে চারজন কারিগর এসে ঘাটে দাঁড়াল। দুজনের মধ্যে কয়েকটা কথার আদান-প্রদান হল। তারপর দাঁড়ের শব্দ করতে করতে নৌকোটা ভেনিস থেকে দূরে চলে যেতে লাগল ফ্রান্সের দিকে। দোকানদারটিও দু'হাজার লিরা পকেটে পুরে বাড়ি ফিরে গেল। কারিগর জুটিয়ে দেবার মুনাফা।

এই চারজনের পালানোর খবর যখন ভেনিসে জানাজানি হয়ে গেল তখন বড্ড দেরি হয়ে গেছে। প্যারিতে তখন এরা আয়না তৈরি আরম্ভ করে ফেলেছে। ভেনিসের রাষ্ট্রদূত এই চারজনকে খুঁজে বার করবার জন্যে অনেক চেষ্টা করেছিল কিন্তু তাদের এত ভাল করে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল যে কেউ বার করতে পারল না। এ ব্যাপারটার শেষ এখানে হল না—আর কয়েকদিনের মধ্যে আবার চারজন কারিগর একেবারে সমুদ্রতীরের পাহারার সামনে দিয়েই ভেনিস থেকে পালিয়ে এল।

ভেনিসের গভর্নমেণ্টের সব রাগ গিয়ে পড়ল ভেনিসের রাষ্ট্রদূতের উপর। তাকে কাজ থেকে ছাড়িয়ে এনে একজন নতুন দূত নিযুক্ত করা হল—এর নাম চিভিস্টিনিয়ানি (Chevistiniani)। নতুন রাষ্ট্রদূত পলাতক কারিগরদের

খুঁজে বার করলেন—আর তাদের নিজের বাড়িতে ডেকে পাঠালেন। তিনি অবশ্য রাজার কারখানায় নিজে যেতে সাহস করলেন না। তিনি এই কারিগরদের দেশে ফিরে যাবার জন্য অনেক লোভ দেখালেন। কিন্তু কোলবার্তও ঘুমুচ্ছিলেন না। তিনিও এদের ফরাসী দেশে রাখবার জন্য যত কিছু সুবিধা পারেন দিলেন। থাকবার জন্য তারা প্রকাণ্ড বাড়ি পেল, মাইনে হল অনেক—বলতে কি তাদের প্রায় প্রত্যেকটা ইচ্ছাই তিনি পূর্ণ করলেন। তাছাড়া এদের পরিবারের সকলকে ফরাসী দেশে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করলেন যাতে তারা রাজরোষ থেকে অব্যাহতি পায়। ভেনিস গভর্নমেণ্ট তাদের পরিবার-পরিজনদের জন্য গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করলেন, কিন্তু তাদের কোনো খোঁজ পাওয়া গেল না। চিভিস্টিনিয়ানি তখন প্রচার করলেন এরা ফিরে গেলে এদের ক্ষমা করা হবে আর তাছাড়া তাদের প্রত্যেককে পাঁচ হাজার ডুকাট পুরস্কার দেওয়া হবে। কিন্তু সে লোভও ব্যর্থ হল। কিন্তু তারা তখন প্যারিতে রাজার হালে বাস করছে। তারা প্যারি ছেড়ে যেতে রাজী হল না। মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞার কথাও তারা ভুলে গেল।

তারপর ১৬৬৭ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে—ভেনিস থেকে পালিয়ে আসার প্রায় দেড় বছর পরে হঠাৎ তাদের সবচেয়ে ভাল কারিগর বিষক্রিয়ায় মারা গেল। তার তিন সপ্তাহের পর গেল আর একজন। এ লোকটি আয়নার কাঁচ তৈরির

কাজে দক্ষ ছিল। ডাক্তার পরীক্ষা করে বললেন বিষপ্রয়োগের ফলে মৃত্যু হয়েছে।

ঠিক এই সময় আবার দুজন কারিগর ভেনিস থেকে ফরাসী দেশে পালিয়ে আসছিল। তারা ধরা পড়ে, আর তাদের প্রাণদণ্ড হয়। কারিগরদের মনে ভীষণ ভয় হল। তারা দেশে ফিরবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল। কোলবার্ত-ও দেখলেন যে এদের আর আটকে রেখে কোন লাভ নেই। ফ্রান্সের কারিগররা তখন আয়না তৈরি করা শিখে ফেলেছে। কাজেই এতগুলো লোককে মোটা মাইনে দিয়ে পুষে রাখার কি দরকার ?

ফরাসী দেশের রাজার কারখানায় তখন একটানা কাঁচের আয়না তৈরি হচ্ছে। ভার্সাই, লুভার প্রভৃতি বড় বড় শহরের প্রাসাদ তখন কাঁচের আয়না দিয়ে সাজানো হচ্ছে। সম্রান্ত ঘরের মেয়েরা ফরাসী দেশে তৈরি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মুখে পাউডার মাখছেন। তখন কি কেউ একবার বেচারা ভেনিস দেশের কারিগরদের কথা মনে করতেন—যারা আসলে এই আয়না তৈরি করেছিল ? শুধু তাই নয়—তার জন্য প্রাণও দিয়েছিল ?

আলমারির মধ্যে কি আছে ?

এইবার চলো আলমারির মধ্যে কি আছে দেখি। এর মধ্যে তোমরা এমন একটা মজার জিনিস দেখবে যার কথা আগে তোমরা মোটেই শোননি। সেটা হল বাতাসের তৈরি

জামা। আর এই বাতাসের জামা থেকেই আমাদের প্রথমেই দেওয়া তিনটি ধাঁধাঁর উত্তর পাবে :

"গরম জামা ইস্ত্রি করার সময় কেন তার ওপর একটা ভিজে কাপড় চাপা দেওয়া হয় ?"

"একটা পশমের কোট পরলে শরীর গরম হয় কেন ?"

"এক রকম কাপড়ের তৈরি তিনটে জামা, না ওর তিনগুণ মোটা কাপড়ের তৈরি একটা জামা পরলে শরীর বেশী গরম হয় ?"

কাপড় জামা পরলে শরীর গরম হয় কেন ?

প্রথমেই আমাদের প্রশ্ন করা উচিত : এটা কি সত্যি যে জামা আমাদের শরীর গরম রাখে ?

আসলে ওভারকোট আমাদের শরীর গরম রাখে না, আমাদের শরীরই ওভারকোটকে গরম রাখে। তা'ছাড়া হবেই বা কি ? ওভারকোট তো আর স্টোভ নয় যে শরীর গরম রাখবে।

তোমরা তাহলে পাল্টা প্রশ্ন করবে : "আমরা কি তবে সকলেই এক একটা স্টোভ ?"

সত্যিই তাই। ভেবে দেখো, আমরা দেখিয়ে দিয়েছি যে মানুষের শরীরের মধ্যে আগুন আছে। আমরা যে খাবার খাই তাই হল এর জ্বালানি। আমরা অবশ্য কোন আগুন দেখতে পাই না ; তবে আমাদের শরীর যে গরম থাকে তা থেকে প্রমাণ হয় যে আমাদের শরীরের মধ্যে আগুন আছে।

তাপ রক্ষা করতে হয়। বাড়িঘর তৈরি করি, বেশ পুরু করে দেওয়াল গাঁথি, তার আসল উদ্দেশ্য হল এই গরমটাকে ঠিক রাখা। শীতকালে ঝড়ঝাপটা বন্ধ করার জন্য দরজা জানালার ফাঁকা ঢেকে দিই এই মতোই। আমরা যে জামাকাপড় পরি তার উদ্দেশ্য ঠিক তাই। খালি তফাত এই যে ঘরের হাওয়াটাকে শরীরের উত্তাপ দিয়ে গরম করার বদলে আমরা গায়ের জামাটাকে গরম করে সেই গরম জিনিসটাকে সর্বদা নিজের কাছে রাখি। অবশ্য জামা থেকে অনেকটা উত্তাপ নষ্ট হয়ে যায় কিন্তু তবুও খালি শরীর থেকে যতটা যায় ততটা নয়। অর্থাৎ আমরা আমাদের নিজেদের বদলে আমাদের জামাকাপড়গুলোই ঠাণ্ডা হতে দিই।

এইবার প্রশ্ন হল ঃ তিনটে শার্ট, না তিনগুণ পুরু একটা শার্ট পরলে শরীর বেশী গরম হয় ?

এর উত্তর—তিনটে শার্ট ?

কারণ গরম রাখার জন্য দায়ী শার্টগুলি নয়—বরং এই শার্টগুলোর মধ্যে যে হাওয়া আছে তাই। হাওয়া উত্তাপ পরিবাহী নয়। কাজেই শার্টগুলির মধ্যে যত বেশী হাওয়া থাকে তত পুরু দেওয়াল দিয়ে আমাদের শরীরের উত্তাপটা আটকানো থাকে। তিনটে শার্ট মানে বাতাসের তিনটে জামা ; কাজেই যত পুরু হোক না কেন একটা জামা দিয়ে ততটা গরম আটকানো যায় না। কারণ একটা শার্ট মানে একটা হাওয়ার জামা।

আমরা বাতাসের দেওয়াল তৈরি করতে পারি কিনা ?

অনেক সময় আমাদের জানালায় ছু-জোড়া কপাট থাকে। শীতকালে আমরা ঐ ছু-জোড়া কপাটই বন্ধ করে দিই—ফলে এই ছু-জোড়া কপাটের মধ্যে একটা বাতাসের দেওয়াল তৈরি হয়। তার মানে ছুটো শার্ট পরলে যে কাজ হয় এতেও ঠিক সেই কাজই হয়।

বৈজ্ঞানিকেরা আবিষ্কার করেছেন যে, একটা ইটের দেওয়ালের চেয়ে একটা বাতাসের দেওয়াল ঘরকে বেশী গরম রাখে। এইজন্য আজকাল ফাঁপা ইট তৈরি হচ্ছে। ফাঁপা ইট দেখতে ইটের মতোই, শুধু ভেতরকার অংশটাই ফাঁপা। এই ফাঁপা ইটের তৈরি বাড়ি সাধারণ ইটের তৈরি বাড়ির চেয়ে অনেক বেশী গরম হয়। এর কারণ ঐ বাতাস।

গরম কালে উলের জামা পরা খারাপ কেন ?

কারণ উল বড় বেশী গরম। তাছাড়া উলের আর একটা বড় দোষ আছে। একবার ভিজলে উল দেরিতে শুকোয়। কাজেই গরমকালে আমাদের ঘামে এগুলো ভিজে থাকে। এ জিনিসটা শুধু যে অস্বস্তিকর তাই নয়, শরীরের পক্ষে ক্ষতিকরও বটে। এইজন্য গরমকালে সুতির জামা পরাই ভাল; এগুলো তাড়াতাড়ি শুকোয় আর উত্তাপ পরিবাহীও বটে।

আমরা গেঞ্জি, আণ্ডারওয়ার এইসব পরি কেন ?

আমরা যদি খালি গায়ের ওপরই জামা পরি তাহলে

আমাদের বেশী শীত করবে, কেননা, আমাদের শরীরের চারদিকে বাতাসের জামা নেই। গেঞ্জি পরলে গেঞ্জি আর জামার মধ্যে একটা বাতাসের জামা থাকে, কাজেই গরম বেশী হয়। অবশ্য শুধু বেশী গরমের জন্যই যে আমরা এই সব পরি তা ঠিক নয়। এর আসল কারণ হচ্ছে, গেঞ্জি ইত্যাদি অনেকবার বেশী কাচা যায়। যেমন উল —উল বার বার কাচা যায় না—সেদ্ধও করা যায় না। সেদ্ধ করলে উল মোটা ও কঠিন হয়ে যায়, কেননা উলের আঁশ সুতোর মতো নয়। উলের আঁশ গায়ে গায়ে লেগে যায়, ফলে উল একেবারে নষ্ট হয়ে যায়। ১৪০° (ফ)-এর বেশী গরম উলে লাগানো উচিত নয়।



এই জন্যই উলের জামা ইস্ত্রি করার সময় খুব গরম ইস্ত্রি ব্যবহার করা উচিত নয়। উলের জামার ওপর একটা ভিজে কাপড় দিয়ে তবে ইস্ত্রি করতে হয়।

সুতির জামাকাপড় কিন্তু গরমে নষ্ট হয় না। এইজন্য জামার নিচে বিশেষ করে উলের জামার নিচে সুতির গেঞ্জি আণ্ডারওয়ার ইত্যাদি পরা উচিত।

শেষ কথা

আমাদের নতুন দেশ দেখা শেষ হল। মেপে দেখলে আমরা হয়ত বিশ পা গিয়েছি। কিন্তু কতো জিনিসই আমরা দেখলাম আর কতো ধাঁধাঁরই আমরা জবাব পেলাম! তোমরা জানো, নতুন কোনো জায়গায় গেলে লোকে হয় কোন "গাইড" নেয় বা সঙ্গে সেই দেশ সম্বন্ধে লেখা বই নেয়। এইসব বইয়ে সেই দেশের নদী হ্রদ সমুদ্র পাহাড় পর্বত শহর গ্রামের ভাল বর্ণনা থাকে—কোথায় কোন্ রাস্তা আছে, কোথায় কোন্ বাড়ি মনুমেন্ট, তাতে কি আছে, সব বর্ণনা থাকে। এই মনুমেন্ট-গুলো কত আগে তৈরি আর কিসের স্মৃতিরক্ষার জন্য? এই রকম গাইড বুক থাকলে পদে পদে লোককে আর জিজ্ঞাসা করতে হয় না—এটা কি, ওটা কেন?

নিজের বাড়ির ভেতরটা ভাল করে যারা দেখতে চায়, তাদের জন্য এই বইটি "গাইড বুকের" মতোই কাজ দেবে।